ঘুম সমাধি সাধনার চাবিকাঠি

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের

বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

রাম নারায়ণ রাম

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-

শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-

ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

সহযোগিতা ঃ-

অনির্বাণ, দেবতনু

প্রথম প্রকাশ ঃ-

শুভ মহালয়া, ১৪১৮

২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০১১

মুদ্রণ

মেসার্স এম. দত্ত

১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট

কোলকাতা - ৭০০০০১

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-

"অভিনব দর্শন"

স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড

পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

মোবাইল - ৯২৩১৮-৯২০৮৫, ৯৪৩২৩-৭২০৭২

Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
infoavinabadarshan@gmail.com

Website : www.avinabadarshan.com (Free Site)
(Bangla, Hindi, English)

প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

মুখবন্ধ

বিশ্ব বিরাটের সত্যবস্তুকে জানার জন্য, বিশ্বের সুরকে আপন আপন সুরে আনবার জন্য, স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করেছেন নব নব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তাঁর সৃষ্টি রহস্য যাতে তাঁর সৃষ্ট জীব অতি সহজে বুঝতে পারে, তাই তিনি নিজেকে আড়ালে না রেখে, রেখেছেন সহজ সরলভাবে সবার ঘুমন্ত সমাধির মাঝে।

জীবনের যাত্রাপথে সহজপথ অবলম্বন করে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে চলাই হচ্ছে সাধনার শ্রেষ্ঠপথ। এরজন্য কোন হোম, যাগ-যজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। সমাধির সুরের সাথে স্বাভাবিক ভাবে জীব যাতে পরিচিত হয়ে, সেদিকে এগিয়ে যেতে পারে, তারজন্যই বিশ্বপ্রকৃতি হতে প্রাকৃতিক নিয়মে সবার জন্য ঘুমের ব্যবস্থা।

ঘুম শুধু ইন্দ্রিয়ের বিশ্রামের জন্য নয়। এর পিছনে রয়েছে সৃষ্টির এক বিরাট উদ্দেশ্য। প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত সত্তাকে জাগিয়ে তোলার সহজতম উপায় হচ্ছে প্রতিদিনের এই ঘুম। ঘুমন্ত অবস্থা আসলে সমাধিরই আরেকটি অবস্থা। যেমন দুই দেশের মাঝখানে No man's land থাকে, তেমনি জাগ্রত ও স্বপ্নের অবস্থার মাঝখানে রয়েছে ঘুমন্ত অবস্থা। এটা এক জাতীয় সমাধি। ঘুমন্ত সমাধিকে কাজে লাগিয়ে জীব যাতে তার নিজের সুরে সুর মিশিয়ে মিশে যেতে পারে সেই মহা সুরের সাথে, তারজন্যই প্রাকৃতিক নিয়মে ঘুম ও স্বপ্নের ব্যবস্থা।

মহা মূল্যবান বস্তু সুসজ্জিত রয়েছে ঘুমন্ত সমাধির মাঝে। এই ঘুমন্ত সমাধি পার হয়েই আমরা স্বপ্নে যাই। আর এই স্বপ্নের আসনই হচ্ছে যোগের সবচেয়ে বড় আসন। বাস্তব জীবনে চলার পথ সহজ করার জন্যই স্বপ্ন।

জানিয়ে দেওয়াই প্রকৃতির কাজ। জীবনে যা কিছু রয়েছে, যা কিছু হবে, তারই আভাষ পাওয়া যায় স্বপ্নে। আমরা যে স্বপ্নের কথা ঘুম ভেঙে যাবার পরও বলতে পারছি, এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে মৃত্যুর পরের অবস্থা। এটাই প্রকারান্তরে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছে, মৃত্যুর পরও সত্তা স্বেচ্ছাধীনভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারে। সুতরাং মৃত্যু মানেই শেষ হয়ে যাওয়া নয়। প্রতিদিনের এই ঘুম সাময়িক মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রতিদিনে ঘুমের যে মাত্রা, জীবনের সব ঘুম একত্রিত হয়ে, শেষদিনে হয় মৃত্যুর মাত্রা। ঘুমন্ত সমাধিতে মনের (স্বপ্নের) সেই মাত্রাকে বাস্তবে আয়ত্তে আনার জন্য সাধকরা সৃষ্টির আদি থেকেই আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছেন। সেই প্রচেষ্টা সফল হলে, সমাধির আসনে বসে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও বিশ্বরহস্য জানতে ও বুঝতে কোন অসুবিধাই হবে না। বিশ্বপ্রকৃতির সাথে তখন যোগাযোগ হয়ে যাবে। এই যোগাযোগই সত্যিকারের যোগ। আর এটা সম্ভব হয়, স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ঘুমন্ত সমাধির মাধ্যমে।

মনের যে মাত্রায় আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপ্ন দেখি, মনের সেই মাত্রাটা যদি জাগ্রত অবস্থায় আনতে পারা যায়, যদি ধরে রাখা যায়, তবে বাস্তবেও বহু অসাধ্য সাধন করা যায়। সব কিছু সফল হয়ে যায় অতি সহজেই। মনের এমন একটি মাত্রা আছে, যেখানে পৌঁছালে দেহের সমস্ত অণুপরমাণু তার রস আস্বাদন ক'রে, তার ভিতর মজে যায়, ডুবে যায়। এটাই হচ্ছে প্রকৃতি পুরুষ বা শিব শক্তির মিলন।

প্রকৃতির নিয়মে আমরা সবাই যে সহজাত সমাধি নিয়ে এসেছি, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেই সমাধির বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়েই সবাই যাতায়াত করছি। যখন আমরা মাতৃগর্ভে কূর্মাসনে ছিলাম, তখনও সমাধিতেই ছিলাম। সেটাও সমাধির আসন। তখনও সমাধির সাথে একই সংযুক্ততায় ছিলাম বলেই, দীর্ঘ দশ মাস ধরে মাতৃ জঠরে থাকার যাতনা সহ্য করতে পেরেছিলাম। সেটাও এক জাতীয় সমাধি।

জীবন যাত্রার পথে মনের দ্বারা কতটুকু কাজ করা যায়, স্বপ্ন হচ্ছে তার মিটার (Meter). দীর্ঘদিন ধরে জপ, ধ্যান করে যা সম্ভব হয় না, স্বপ্নে তা সম্ভব হয় অতি সহজে। ঘুমের ভিতর দিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে মনের ক্লেদ পঙ্কিলতা কেটে গিয়ে, মনটা filtered হয়ে, স্বচ্ছ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। স্বপ্নাবস্থায় মনে কোন দ্বন্দ্ব বা সমস্যা থাকে না। তাই তখন মনের একাগ্রতা বহুগুণ বেড়ে যায়। বাস্তবে অগণিত বিষয়বস্তুর মাঝে ছড়িয়ে থাকা মনটা concentrated হয় বলেই, মুহূর্তে তার অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফূরণ হয়। তখন অতি সহজে দুর্লভ বস্তু করায়ত্ত করা সম্ভব হয়। তারই জন্য প্রকৃতির নিয়মে এই ঘুমের ব্যবস্থা। বিশ্ব প্রকৃতির বিরাট দান হচ্ছে এই নিদ্রা সমাধি। নির্বাণ নির্বিকল্পের চেয়েও বড় হচ্ছে শবাসনে এই নিদ্রা সমাধি বা ঘুম সমাধি।

অনেকে কঠোর পরিশ্রম করে সাধনা করছেন। নানা নিয়ম নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কত কঠিন কঠিন যোগ প্রাণায়াম, রেচক, পূরক, কুম্ভক করছেন। কিন্তু সেইসব নিয়ম কানুন এই সংসারের আবিলতায়, জটিলতায় থেকে সবসময় চর্চা করা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে সমাধির নানারকম ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু প্রায় কোন শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যাতেই সমাধির প্রকৃত সুর সঠিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। সমাধিতে যাঁরা ডুবে থাকেন, শুধু তাঁরাই এর মর্মার্থ বুঝতে পারেন, এর সত্যিকারের অর্থ বলতে পারেন; সমাধির প্রকৃত সুর ধরতে পারেন।

এই স্বল্পায়ু জীবনে জীবের পক্ষে সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য নিদ্রা-সমাধির পথই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ পথ, শ্রেষ্ঠ পথ। ঘুম সমাধির শবাসন থেকে জীব যাতে দুর্লভ বস্তুর সন্ধান পেতে পারে, তারই জন্য জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনো ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বা বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো তাঁর এই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'অভিনব দর্শন' প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের **৩৮-তম** শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হলো, **ঘুম সমাধি সাধনার চাবিকাঠি**।

পরিশেষে জানাই, পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, যে সকল ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে, এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ মহালয়া, ১৪১৮
২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০১১

চপল মিত্র
(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)

ঘুমন্ত সমাধিতে, সমাধির ব্লটিং পেপারে মন সহজ স্বচ্ছ ও দ্বন্দ্বমুক্ত হয়ে যায়।

২৮, ল্যান্সডাউন টেরেস, কলিকাতা।
১২ই মার্চ, ১৯৬৭

খুব টায়ার্ড (ক্লান্ত)। সারাদিন পরিশ্রম করেছি। খুবই ক্লান্ত লাগছে। (বেদমন্ত্র...) এই যে আকাশ, এই যে ফাঁকা জায়গা দেখছো, তারমধ্যে যে সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ আছে, সবই ফাঁকাকে আশ্রয় করে রয়েছে। এই যে জগৎ, অনন্ত জগৎ, কি সুন্দর নিয়মের ধারাবাহিকতায় চলেছে। সমস্ত জগৎটাই শাস্ত্র-গ্রন্থ। সমস্ত বিশ্বটাই গ্রন্থ। প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ করো।

বেদ (প্রকৃতি) হ'তে যে শাস্ত্র এসেছে, বেদের যে আদি সুর, তার অর্থ ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিকৃত হয়ে গেছে। তারফলে দেশে দেশে আজ বিবাদ-বিচ্ছেদ; সমাজের মধ্যে সবকিছু দলগত, সম্প্রদায়গত হয়ে গেছে। চারিদিকে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু জাতিগত দিক দিয়ে, নীতিগত দিক দিয়ে আমরা সবাই আকাশস্থিত জীব, আমরা সবাই এক আকাশের সন্তান। আমাদের চিন্তার বিষয়বস্তুর উৎস এক। যেই থট, যেই সুর হ'তে এই দেহ-মন, সবই বস্তু বিশেষ। বস্তুর বস্তুত্বের সন্ধানে আগে চলে যাও। ভগবানের চিন্তা পরে আসবে। আগে বাহ্যিক অনুভূতিতে যা আছে, বাহ্যিক চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকে যা আছে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা আসে, তা চিন্তা কর।

আমরা যে ভগবানকে ডাকবো, ভগবানের চিন্তা করবো, কার উপর নির্ভর করে করবো? সেই নির্ভরযোগ্য সম্পর্কটা কোথায়? ভগবানকে যে ডাকবো, তাঁর নিকট যে আত্মসমর্পণ করবো, তার আগে সম্পর্কটাতো জানা দরকার। এই ইউনিভার্স কে সৃষ্টি করলো? কোত্থেকে এল? কিভাবে এল? আমরা কোথা থেকে এলাম? কোথায় যাব কিছুই জানি না। কার অন্তরালে কোন্ নিয়মে জগতে সবকিছু রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে? পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে? এই যে চেতন, এই যে চৈতন্য, এই যে দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, শ্রবণ ইত্যাদি বিভিন্ন শক্তি, কিভাবে আসছে? এই **পরিবর্ত্তনশীল জগতে কার প্রভাবে এইসব পরিবর্ত্তন হচ্ছে? নিশ্চয়ই একজন চৈতন্যসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন, যাঁর প্রভাবে যাঁর জন্য এই সব কিছু একটা নিয়মের মাধ্যমে চলেছে।** এই যে প্রয়োজনের সাথে সাথে, নেসেসিটির সাথে সাথে সবকিছু আসছে, প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে এই যে যোগ, এটাই হলো যোগাযোগ।

পেন্ডুলাম থাকে বটে, তাকেও ধাক্কা দেওয়া দরকার। এই যে যোগাভ্যাস, কি করে আসছে? এই যে ধ্যেয় বস্তুতে মনোনিবেশ করছে, আসনে বসছে, আজ্ঞাচক্রে (দুই ভ্রূর মধ্যবর্ত্তী স্থানে) মনোনিবেশ করছে, এই যোগাযোগ করবার নিয়মাবলী কোত্থেকে আসছে? **শাস্ত্রকারেরা, বেদজ্ঞরা অগণিত বস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ করে, বস্তুর বস্তুত্বকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছেন, এমন একজন চৈতন্যময় পুরুষ আছেন বা থাকতে পারেন, যাঁকে ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ বলা যায়। যাঁর সম্পূর্ণ জ্ঞাতে না থাকলে, এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ধারা এমন সুন্দরভাবে চলতে পারে না। তাঁকে পূর্ণ বলা যায়। তাঁকে**

ভগবান বলা হয়। কিন্তু তাঁকে খুঁজে সম্পূর্ণ সামনে আনা যায় না। তিনি খোঁজের মাঝে নিখোঁজ হয়েই রয়েছেন।

আমরা পাথরে বা পুতুলে ভগবানকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করি। আমরা তাঁকে পুতুল খেলনায় এনেছি। পাথর হতে তাঁর রূপ জাগে কি না, সে সম্বন্ধে প্রায় সকলেই সন্দিহান। তাই সমাজের সবাই সেটা গ্রহণ করছে পারছে না। **যে জিনিস, যে মতবাদ সত্যিকারের বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিসম্মত, ন্যায়সম্মত, সেটা সর্ববাদীসম্মত। জগতের সবাই সেটা গ্রহণ করবে।** কিন্তু আজ এক দেশের মতবাদ অন্য দেশ গ্রহণ করতে পারছে না। তাহলে ভগবান সম্পর্কে এমন এক জায়গায় বিভ্রান্তি রয়েছে, ভুল রয়েছে, তারজন্য সকলে সেটা গ্রহণ করতে পারছে না। কিন্তু আকাশ, বাতাস, জল, মাটি— এসব তো সমস্ত জাতিই গ্রহণ করছে। এসব যদি সবাই গ্রহণ করতে পারে, তবে নীতিগতভাবে ভগবান সম্পর্কে মতবাদ গ্রহণ করতে আটকাচ্ছে কোথায়?

কারও মতবাদ সবাই সম্পূর্ণভাবে নিতে পারেনি বলে, 'ভগবান'কে নিয়ে এক একজন এক একভাবে সাম্প্রদায়িকতা করছে। এর ফলে দেশের মধ্যে জাতিগত নীতিগত বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ কেউ সম্পূর্ণভাবে ভগবানকে জানতে পারে নাই। ভগবান শুধু নামেই রয়েছে। ভিতরের সঙ্গে, অন্তরের মাঝে ভগবানকে নিয়ে যোগাযোগ করতে পারেনি। যদি সম্পূর্ণভাবে ভগবানকে জানতো, সেই যোগাযোগে যুক্ত হতে পারতো, তাহলে কোন ব্যতিক্রম হতো না। সাগরদর্শনে তো কারও ব্যতিক্রম হয় না। সেখানে একটা পিঁপড়াও সাগর দেখতে পারে, সবাই দেখতে পারে। তবে ভগবানের বেলায় কেন এই

ব্যতিক্রম হয়েছে? কেন এত দ্বিধা দ্বন্দ্ব রয়েছে?

ভগবানের ভগবত্তা সম্পর্কে সকলকে একমতে পথে আনাই আমার কাজ। সকলের ভিতরে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, তার মীমাংসা করার জন্যই আমার সকল চেষ্টা। আজ ঘরে ঘরে সবটাই আছে, কেবল নুনটাই নেই। যে নুন তাচ্ছিল্যভাবে থাকে, তাই নেই। তারজন্য সব বেস্বাদ হয়ে গেছে। তারজন্য মুখে নিয়ে ফুঁৎ করে ফেলে দেয়। দেখ, সূর্য আছে, চন্দ্র আছে, কত রূপ, কত গুণ আছে, কত দৃশ্য আছে। চারিদিকে সব রূপময় হয়ে আছে। কিন্তু চিন্তার দিক দিয়ে কোথায় যেন গরমিল হয়ে যায়। পুরোপুরি কাউকেই নির্ভর করতে পারছে না। কেবল সত্যিকারের কার উপরে নির্ভর করবে, তাকেই খুঁজে পাচ্ছে না। ফলে শুরু হয়ে গেল ফাঁকি, ঝুঁকি। নানা গল্‌তির পথে শয়তানি ঢুকে পরলো। সমাজ একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার উপক্রম হলো।

দেশে যেমন জল নাই, সব মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের চিন্তার মধ্যেও আসল বস্তু নাই। নুন যে স্বাদ দেয়, তা রয়েছে সাগরে। এতবড় সাগর, সেটাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সাগর জলে ভরপুর। কিন্তু সাগরের জল দিয়ে রান্না করা যায় না। **সাগর বিরাট। যে রূপ নিয়ে সাগর, যে রূপে সাগর ব্যাপ্তমান; ভগবানের ভগবত্তাও যেন সর্বত্র বিরাজ করছে সাগর (বিরাট) হয়ে। প্রকৃতির জাগ্রত শক্তি, চৈতন্যময় শক্তি যেটা, সেটা সাগরের ন্যায় ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।** সেখানে কোন গল্‌তি নাই। তবুও খট্‌কা যে ঢুকে রয়েছে মনের মধ্যে, তা আর দূর হয় না। এই খট্‌কা যদি ঢুকে না থাকতো, তবে আর কোন অসুবিধা হতো না। চৈত্র

মাসে রাস্তার পিচ্ গরম হয়, তখন খালি পায়ে হাঁটলে সবারই পায়ের তলায় ফোস্কা পড়ে। সবাই তখন শেড্ চায়।

দেবতার এতবড় দান, এতবড় যে সৃষ্টি, তাঁর কাছে কেন সবাই মাথা নত করতে পারি না? যিনি খাওয়াচ্ছেন, পরাচ্ছেন, প্রয়োজনের সাথে সাথে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, তাঁর দিকে আমাদের মন নেই কেন? বাতাস শুষ্ক বলে মনে হয়। কিন্তু কয়েক শত সাগরের জল বাতাসে বয়ে যাচ্ছে। বাতাস যে শুষ্ক, সেই শুষ্কেও সাগর রয়েছে, সেটা পরিব্যাপ্তমান। কিন্তু তাতে সাগরের রূপটা নেই। দেবতার যে ইঙ্গিত, স্রষ্টার যে সত্তা সমস্ত বিষয়বস্তুতে রয়েছে, স্রষ্টার সেই মনের সঙ্গে নিজেদের অন্তর মিলাতে পারছি না। এরজন্য সমাজের অসম্ভব ক্ষতি হয়ে গেছে। যাঁর কল্যাণে আছি, যিনি সব ব্যবস্থা করেছেন, সেদিকে মন নাই। আর যাঁরা ভগবানে মন দিয়েছেন, বেশীরভাগই ভয়ে আতঙ্কে। সেটা কিরকম? বিনা টিকিটে ট্রেনে গেলে যেমন আতঙ্ক হয়, সেরকম।

আমাদের সব কিছু থাকা সত্ত্বেও আমাদের মনে শান্তি নেই। আমরা একটা আতঙ্কে আছি। মনটা আছে কিসের মধ্যে? ইন্দ্রিয়ের সাময়িক বৃত্তির, ক্ষুধার নিবৃত্তিতে। প্রত্যেকের দেহের ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির নিবৃত্তির জন্য মন রয়েছে। এর জন্য কত কবিতা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কবির কবিতায় সেই বিরাটের সুর নেই। কবিতার মধ্যে সেই মন নেই। যাঁকে আশ্রয় করলে সত্যিকারের আশ্রয় পাওয়া যায়, কবির কল্পনায় তাঁর চিহ্নমাত্র নেই। হয়তো ভাবের আবেগে কবিতা পাঠ করে; দু'এক ফোঁটা চোখের জল পড়লো; কিন্তু মন যে থাকে না। এইভাবে যদি মন না থাকে, খট্‌কা না দূর হয়, তবে সমাধান কোথায়?

তুমি যেখানেই যাও, সবাই খাচ্ছে দাচ্ছে, কাজ কর্ম করছে, কিন্তু বাঁধুনি নেই। বাঁধুনি না থাকলে যেমন হয়, সেই অবস্থাই চলছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে। কাজেই ইন্দ্রিয়ের প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে বেশী। সেটাকে মিটাতে গেলে এদিকে অভাবে পড়ে যায়। সেটাকে সামলাতে গিয়ে মনের মধ্যে খট্‌কা থেকে যাচ্ছে। তুমি যেদিন মনের মধ্যে, দ্বিধা দ্বন্দ্ব মুক্ত হয়ে বলতে পারবে, 'আমি একাজ করবোই', সেই কাজে সফলতা অনিবার্য। তুমি যদি সম্পূর্ণভাবে মনের থেকে বলতে পার, 'আমি পাশ করবোই', তাহলে ঠিক পাশ করবে। এই যে যারা পরীক্ষা দেয়, এভাবে বলতে পারে না।

পোকার (Poker) দিয়ে খোঁচা দিলে, তবেই ষ্টোভ জ্বলে, জানো তো? এতবড় ষ্টোভ, সবটাই আছে তবুও ভিতরে পিন্ দিয়ে ওটাকে না খোঁচালে জ্বলবে না। এইটুকুনু পোকার (Poker), তার কত ক্ষমতা। **পোকারের খোঁচা না দিলে ষ্টোভ জ্বলবে না। আমাদের মনের মাঝে ঐ পিন্‌টা সময়মতো জাগাতে পারলেই এক নিমিষে হয়ে যাবে।** তুমি বীরভাবে কথা বলবে। আবার মনের মাঝে চিন্তা করবে, 'কি করে হবে?' তাহলে হবে না।

এখানে সাধক মহান, যাঁরা বড় হয়ে গেছেন, তাঁদের ঐ Pin-টা ঠিক আছে। তাঁদের পোকারটা সব সময় ঠিক রয়েছে। কাজেই যখন যা যা বলেন, ঠিক হয়ে যায়। তোমাদের মধ্যে পিন্‌টা ঠিক নেই। বাবা তার শিশুপুত্রকে বলে গেছে, ঠাকুরকে খাওয়াতে। শিশু বারেবারে বলছে। কিন্তু পাথরের ঠাকুরতো খায় না। শেষে বলে, ''খাবে তো খাও, নাহলে গুঁড়া করে দিমু।'' তখন পাথরের মূর্ত্তি থেকে দেবতা বেড়িয়ে খেয়ে

নিলেন। শিশুমনে কোন খট্‌কা নেই। শিশুমন নিয়ে যা বলে, তাই হয়ে যায়। কাজেই মন থেকে এই খট্‌কাকে দূর করতে হবে।

এই খট্‌কাকে কি করে দূর করা যায়? প্রকৃতির নিয়মে এটা রয়েছে। তোমাদের মনে খট্‌কা আসতে পারে। আসতে যখন পারে, তার প্রতিবিধানও রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে ঐ সমাধানের প্রস্তুতির জন্য কসাস্‌টা দিয়ে দিয়েছে।

আর একটা উপায় হচ্ছে স্বপ্ন। **প্রতিদিনের ঘুমন্ত সমাধিতে স্বপ্ন, প্রকৃতির এক মহাদান। স্বপ্ন হচ্ছে, বিরাটের সাথে যোগসূত্রের, যোগাযোগের এক সহজ ক্রিয়া, অতি পরম বস্তুকে লাভ করার এক সহজ পথ।** স্বপ্নে হয়তো দেখছো, বাঘে তাড়া করেছে। তোমার পাখা গজিয়েছে। তুমি উড়ে যাচ্ছ। আর মনে মনে বলছো, 'এখন কি করে ধরবি বাঘ।' **স্বপ্নে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত খট্‌কা ছিন্ন হয়ে, মনের দরজা খুলে যায়।** ভিতরকার যন্ত্রগুলি সহজেই প্রকাশ পায়। তাই স্বপ্ন ইঙ্গিত দিচ্ছে, তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তুমি তোমার ঘুমন্ত সমাধিতে ঐ অবস্থায় যা চিন্তা করবে, তাই হবে। স্বপ্নে মনের ঐ মাত্রাটা যদি জাগ্রত অবস্থায় ধরে রাখতে পার, তবে জেগেও তুমি বাড়ীর পুকুরের উপর দিয়ে দৌড়াতে পার। মনে কর, **স্বপ্নে তুমি ১৬ মাত্রায় ছিলে। মনের ঐ ১৬ মাত্রা জেগেও যদি রাখতে পার, তবে জলের উপর দিয়েই হাঁটতে পারবে।** কিন্তু মানুষ জেগেই ভাবে, 'জলে ডুবে গেলাম বুঝি।' তাই ডুবেই যায়।

কারও বাবা কবে মরে গেছে। স্বপ্নে দেখছে, বাবা বলছে, 'কই তুই স্কুলে গেলি না?' কেউ হয়তো স্বপ্নে বিছানায় প্রস্রাব করে। স্বপ্নে বেশী খেলে পেট ফেঁপে যায়। স্বপ্নে বোবায়

ধরলে 'আউ আউ' করে। দম বন্ধ হয়ে কেউ কেউ মারাও যায়। পাশে যে শুয়ে আছে, সেও ভরসা পায় না। তুমি জেগে 'আউ আউ' করলে লোকে হাসবে। ঘুমের মাঝে 'আউ আউ' করলে মানুষ ভয় পায়। এমন অবস্থায় ঘুমন্ত সমাধিতে মুহূর্ত্তে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। একই মন তোমার— তুমি জেগে আছ। তুমি ঘুমিয়ে আছ। একই জল — ঘোলা জল। আর ব্লটিং পেপার দিলে তা হতে স্বচ্ছ জল পড়ছে।

ঘুমালে কি হয়? তুমি সমাধির মাত্রায় চলে যাও। **মনের মধ্যে যে ভেজাল থাকে, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, হতাশা-নিরাশায় মন ভরে থাকে, ঘুমন্ত সমাধিতে সমাধির ব্লটিং পেপারে মন সহজ স্বচ্ছ দ্বন্দ্বমুক্ত হয়ে যায়।** সেই মনে তখন যা চিন্তা করা যায়, তাই হয়ে যায়। যদি বলি, ''সব সময় জপ করো। তাই করতে হবে। জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বে। আবার জেগে উঠেও জপ করবে।''

যত মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁরা সবসময় জপ করতেন। যোগী যারা দিনরাত জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। ঐ ঘুমন্ত সমাধিতে যা হয়, জাগ্রত অবস্থায় সেটা আনতে চেষ্টা করে। এই যে পাহাড় থেকে জল পড়ে; অবিরাম অফুরন্ত ধারায় জল পড়ে চলেছে। তাতে একটা চাকা (ডায়নামো) লাগিয়ে (fit করে) দিলেই হয়। সুন্দর ইলেক্‌ট্রিক, হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপন্ন হচ্ছে। এই যে জলের মধ্যে চাকা ঘুরতে আছে, আর বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়ে সুন্দর বাতি জ্বলতে আছে। আমরা প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা যে ঘুমিয়ে থাকি, আমাদের ঘুমের এই ছয় ঘণ্টাকে যদি কাজে লাগানো যায়, তবে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে থাকতে পারবে। জপ করতে করতে যদি ঘুমিয়ে

পড়া যায়, আর ঘুমের মধ্যে যদি টিক্ টিক্ করে জপটা চালিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে ঐ ঝরণার চাকার মত ডায়নামো fit হয়ে যায়। তাতে হবে কি? ঘুমের মধ্যে জপে তেজ হয়ে যাচ্ছে বেশী। স্বপ্নে হয়তো জেগেছে। জেগেও কাজ করছে।

নবদ্বীপ ব'লে এক শিষ্য আছে আমার। তাকে বলেছিলাম, 'তোকে স্বপ্নে জপ দিমু।' সে সারাদিন হাঁড়ি পাতিল বিক্রী করতো। আর সন্ধ্যে হলেই বলতো, 'ঠাকুর আমি শুয়ে পড়ি'। সে স্বপ্নে ভোর না হওয়া পর্যন্ত একটা আসনে বসে জপ করতো। আবার ধূপকাঠি গুগ্গুল স্বপ্নেও একটা জায়গায় পাওয়া যায়। একদিন চাবি পায়নি। স্বপ্নে একই জায়গায় চাবি দেখে। চাবিটা বৌয়ের কাছে রয়েছে। আমাকে স্বপ্নে বলছে, ''আমি কি করে চাবি আনবো?''

আমি বলি, ''যা বৌয়ের কাছে গিয়ে নিয়ে আয়''। — ''না, তাহলে আমার স্বপ্ন ভেঙে যাবে।''

সে আবার জপ করতে বসলো। তারপর স্বপ্নে শূন্যে উঠতে আরম্ভ করলো। ঘুমের মধ্যে সে দেখছে, মেঘনা নদীর উপর জপ করছে, মাথার উপরে চাঁদ। বউ দেখে, ঘরের মধ্যে সিলিং-এর ওখানে শূন্যে রয়েছে। ওকে কাপড় ধরে টেনে নাবালো। এইরকম করতে করতে ঐ ঘুমন্ত মনটা জেগেও রয়েছে। তাতে দেখে সর্বনাশ। পায়খানায় বসেছে, উঠে গেছে। প্রস্রাব করতে গেছে, উঠে গেছে। বসতেই পারছে না। তখন দৌড়ে এসেছে আমার কাছে। মনটা এমন হয়ে গেছে। ভিতরে জপ সুন্দর চলেছে। কত দেবতা আসছে। দর্শন হচ্ছে। নবদ্বীপ আমাকে বলে, ''ঠাকুর, এতদিনে বুঝলাম, এই জগতে ঘুম, স্বপ্ন কেন দিয়েছে। এত সহজ পথ, কি সুন্দর সমাধির পথ দিয়েছেন ভগবান।''

আর আমরা কি করি? এই ঘুমন্ত সমাধিকে আমরা শুধু উপভোগ করি বালিশ নিয়ে। ট্রেনে যাও, বাসে যাও, সেই সমাধি সবসময় তোমাদের ধরে রেখেছে। এই সমাধিকে নিয়ে আমরা শুধু ছিনিমিনি খেলি। কিন্তু এই সমাধিকে কি সুন্দর কাজে লাগানো যায়, তা দেখি না। নবদ্বীপ সেটা উপলব্ধি করেছে। আসন করে যে সমাধি, আমাদের সেই সাধনা মাতৃগর্ভে ছিল। মাতৃগর্ভে আমরা সাধনায় ছিলাম। সেই সাধনাই তো সমাধির সাধনা। সেইটাই নিতে হবে। ঐ খট্‌কাকে দূর করতে হবে। তোমরা যে প্রতিদিন ঘুমাও, এই ঘুমটা না দিলেও তো চলতো। প্রতিদিনের এই ঘুম, এমন সুন্দর পথ, এমন সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। **ঘুমিয়ে যদি কিছু না দেখতাম, তাহলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু ঘুমের মধ্যে এই যে স্বপ্ন দেখা, এই দেখা ক্রিয়াটাই প্রকৃত যোগ। এটাই সাধনার বিশেষ সোপান।** এইভাবে ঘুমন্ত সমাধির মাত্রায় মাত্রায় সাধনার বিভিন্ন স্তরে একটার পর একটা চললো, ক্রমে নির্বিকল্প সমাধির স্তরে উন্নীত হলো।

সাধারণ ভাবে যে জিনিস দেওয়া আছে, তাকে কাজে লাগাও। প্রতিদিনের ঘুমটা তোমাদের সাথের সাথী, আপনিই আসে। তাকে কষ্ট করে আনতে হয় না। একটা বয়সে অবশ্য চেষ্টা করে আনতে হয়। মৃত্যুর ঘুমটাও ঘুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে যায়। ঐ ঘুমটাকে যদি কাজে লাগাতে পার, তাহলেই হয়ে গেল। জপ করতে করতে ঘুমাবে। ঘুমের মধ্যেও জপ করবে। এভাবে কাজে যদি লাগাতে পার, তবে দেখবে অতি সহজে সব সমস্যার সমাধান হবে। খালি চেষ্টা কর। একবার যদি কাজে লাগিয়ে দিতে পার, এটাই চরম পথ। **যত সাধক মহান এই**

ঘুমন্ত সমাধিতেই সব আদেশ, সব নির্দেশ পেয়েছেন। সমাধান করেছেন সব খট্কা।

সাধকরা বেশীরভাগ এই যে চক্ষু বুঁজে বসে থাকে, এর ভিতরে একটা মাদকতা আছে। তাঁরা যখন কারও কথা শোনে, চক্ষু বুঁজে শোনে। এই ঘুমটাকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের মনে কোন খট্কা থাকবে না। তাহলে সব কাজ কত সহজ হয়ে যাবে। এখানে বসে হাত দিয়ে দার্জ্জিলিং হতে কমলা নিয়ে আসতে পারবে। কেমনে নিয়ে আসবে, বলা যায় না। তবে আসবে। ঘুমের মাধ্যমে যোগাযোগ ক্রিয়ার ফলে আসা যাওয়ার পথটা সহজ হয়ে যায়। **স্বপ্নে যা দেখা যায়, সেই ঘটনাগুলি তোমার জীবনে যে সত্যি ঘটবে, তা নয়। তবে মনের পরিচয়টা অর্থাৎ মন যে বিভিন্ন কাজে যুক্ত হচ্ছে, বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করছে, মনের এই পরিচয়টা সত্যি। আবার স্বপ্নে যেটা দেখছো, যদি মনে কর, শূন্যে যাচ্ছ, বাস্তবে তা হয়ে যাবে।**

আমি (শ্রীশ্রীঠাকুর) জীবনে দু'তিন দিন স্বপ্ন দেখেছি। একদিন দেখি, অনেক সাদা হাতি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন বলে, 'এগুলো আপনাকে প্রণাম করতে এসেছে।' এরা জঙ্গল থেকে আসছে।

আমি বলি, 'তা হতে পারে।' হাতিগুলো মাথা নোয়াচ্ছে। প্রণাম করতে আসছে। হঠাৎ একটা সোনার চূড়া ধুপ্ করে পড়ে গেছে। আমি জেগে উঠেও ঘুমের ঘোরে বলছি, 'এই যে সোনার চূড়াটা, সোনার চূড়াটা রয়ে গেল যে। এটা নিয়ে এখন কি করি?' এই বলতে বলতে তাকিয়ে দেখি, ২/৩ জন দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। তারা এসে বলে, ''ঠাকুর, এই নাও শালগ্রামের সোনার চূড়া। কাল স্বপ্নে দেখেছি। নারায়ণের চূড়া,

তোমায় দিতে কইছে (বলছে), নাও।''

আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখি, ''আমি তো এটাই দেখেছি। স্বপ্নে দেখলাম সোনার চূড়া। এলো দেখি অন্য জায়গা থেকে। এটাকে নিয়ে এখন কি করি?''

একজন বলে, 'প্রভু, ওটা আমায় দিয়ে দাও। যত টাকা লাগে দেবো।'

আমি বলি, 'আরে টাকা দিয়ে কি সবকিছু পাওয়া যায়?' তারপর দিয়েছি।

সে ওটা নিয়ে বসে গেছে। কারও সাথে কথা বলে না। শুধু জপ করে।

কোনারক সূর্যমন্দিরে অনেককে নিয়ে বসে আছি। আমি বলছি, ''এখানে শ্রীরামচন্দ্র এসেছিলেন। এখানে সূর্য দেবতা ছিলেন।'' হঠাৎ একটা শুকনো তুলসীপাতা উড়তে উড়তে আমার ডানপায়ের হাঁটুর উপর এসে পড়লো। সেখানে কোন তুলসী গাছ নেই। হঠাৎ একজন বলছে, ''নিশ্চয়ই কোন যোগাযোগ আছে।'' এই যে চিন্তাধারা, সুরটার সঙ্গে সঙ্গে সবসময় সেই অবস্থায় থাকলে, যেখানেই যাও যোগাযোগটাও সেভাবে আসবে।

আমি পত্রিকা পড়ি নাই। 'মীরকাডিম' নামে একটি জায়গায় ঘরে ঘরে Pox হচ্ছে। সমানে মরছে। নেবার লোক নাই! আমি জাহাজ হতে নেবেছি। খুব পিপাসা পেয়েছে। সঙ্গে যে ছিল তাকে বলি, ''এই যে পিপাসা পেয়েছে, এটা পক্সের আভাষ।'' আর শুনি একটা লালপেড়ে শাড়ী পরা মেয়ে সারা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মীরকাডিমে সবাই দেখেছে। তখন তো একটু বিভূতি-টিভূতি হয়ে যেত স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে। একটা

গাছতলায় বসেছি। হঠাৎ একজন ডাব নিয়ে আসছে। বলে, ‘‘একজন মহিলা পাঠিয়ে দিয়েছে।’’ সঙ্গের ছেলেটি বলে, ‘‘কর্তা, ঐ মহিলাতো আমার গায়ে ধুলা ছিটিয়েছে।’’

—তাহলে তো তোর পক্স হবে। কইতে কইতে দু’চারটে পক্স বেরিয়েছে। আমি কইলাম, ‘‘একটা মালসা নিয়ে আয় তো’’। আমি ঐ মহিলার উপর ধুলা ছিটাতে বসলাম। তারপর সেখান থেকে পক্স চলে গেল। ঐ মহিলাকে দেখে নাই, এমন কেউ নাই; সবাই দেখেছে। এই যে রূপ নিয়ে আসছে, তার মধ্যে দেবতা আছে, ভগবান আছে, মহান আছে।

তখন সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘‘পক্স-এর দেবতাকে তো সবাই দেখলাম। তবে ভাল দেবতাকে দেখি না কেন?’’

আমি বলি, জল যে টানে হাতীর শুঁড় দেখেছ? এই শুঁড় যখন আকার নেয়, জল টেনে নিয়ে যায়। এইরকম মানুষের মনন শক্তি যদি একত্রিত হয়, যেকোন রূপ নিতে পারে। মা কালী আসছে। মাটির মা কালী, কেমন কথা বলে। চারিদিকে এত মরা দেখে পক্স-এর দেবতা মনের মধ্যে এসেছে। স্বপ্নের সময় (মনটা) যেই রকম হয়, ঐ ভাবটা বহাল হ’ল বলেই সেই শাড়ী পরা মহিলাকে দেখেছ।

এই আশু সেন, তাকে আমি জ্যাঠামশায় বলতাম, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জাজ্জ্বল্যমান দেখতে পেতেন। তার ঘরের সামনে একটা বাঁশ ছিল। একদিন স্বপ্নে দেখছেন, ঐ বাঁশের উপর বসে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ‘‘তোর তো এমনি হবে না। তুই দীক্ষা নে। তা না হলে হবে না।’’

—আমি কার কাছে যামু?

—তুই ওর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) কাছে যা। সেই মন্ত্র দেবে।

—তাহলে তোমায় পাব? জেগে দেখে, বাঁশটা নড়ছে। তার বৌকে ডেকে আনছে। বৌ তো শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেল না। সবাইকে দেখিয়েছে, বাঁশটা নড়ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত বাঁশ নড়েছে, হাত জোড় করে রয়েছে। তারপর এসে আমার পায়ে ধরেছে।

আমি বলি, ‘‘জ্যাঠামশাই, করেন কি? পায়ে হাত দিচ্ছেন কেন?’’

—তুমি আমারে নাম দেও না।

—না, আমি দেব না। রগড় করে বলি।

—কৃষ্ণ কয়েছে, তুমি আমারে নাম দেও।

—তখন তাকে কৃষ্ণ মন্ত্র দিলাম। আমি যখন বলতে আরম্ভ করেছি, চক্ষু বুঁজে তন্ময় হয়ে রয়েছে। ঐ বাঁশে বসে শ্রীকৃষ্ণ হাসছে।

আমি বলি, ‘‘জ্যাঠামশায়, শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছেন আপনি? আপনি এই কৃষ্ণে লীন হয়ে যান! জ্যাঠামশায়, আপনি ষ্ট্যাবিং-এ মারা যাবেন। যদি ঐ ষ্ট্যাবিং-এ মারা না যান, তাহলে অনেক বছর বাঁচবেন।’’

—আমি ষ্ট্যাবিং-এ মারা যাব?

—হ্যাঁ। তবে সামান্য জিনিসের প্রতি মায়ার জন্য ষ্ট্যাবিং হবেন। তখন ১৯৩৭ সালে আমি একথা বলেছি। তার ১৫ বছর পরে ঢাকায় বিরাট Riot হলো।

আশু সেন গেন্ডারিয়ায় মেয়ের বাড়ীতে এসেছে। চারিদিকে মুসলমান ঘিরে ফেলেছে। গেন্ডারিয়ায় খাল আছে। সবাই ঐ খালের পারে চলে যাচ্ছে। সেখানে হিন্দু বসতি। আশু সেন খালের এপারে চলে এসেছে। আবার একটা ধামার মধ্যে কয়েকটা খেলনা পড়েছিল। সেগুলি আনতে যাচ্ছে। ঐ পার হতে কে যেন বললো, ''ওগুলি আনতে যাবেন না।'' কারও কথা না শুনে সামান্য ঐ খেলনাগুলি আনতে গেল আর ষ্ট্যাবিং-এ পড়লো। জ্যাঠামশায়ের তখন মনে হলো, 'ও' (শ্রীশ্রীঠাকুর) তো না করেছিল। হে কৃষ্ণ ব'লে আর আমার নাম করে মারা গেল। মৃত্যু সময়ে ষ্ট্যাবিং-এ রক্ত দেখলো, আর কৃষ্ণ দর্শন হয়ে গেল। হাসতে হাসতে মারা গেল। মুক্তি পেয়ে গেল। আশু সেনের কথা আগেও অনেক বলেছি। তার ছেলেমেয়েরা আসতো আমার কাছে।

দেখ, তোমাদের কাছে সবই সুন্দর হয়ে রয়েছে। কেন হবে না? তোমাদেরও হবে। তোমাদের পাশে বিষ্ণু ঘুরছে। তোমাদের পাশে পাশে দেবতারা ঘুরছে। অপেক্ষা করছে; শুধু স্মরণের অপেক্ষা করছে। দৈনন্দিন জীবনে চাহিদা, সামান্য চাহিদা। মনে হয়, এটুকু না পেলে শেষ হয়ে গেলাম। কিন্তু এর চেয়ে আরও কত লক্ষ লক্ষ চাহিদা ফেলে এসেছিস্। কত বাবা মা ফেলে এসেছিস্। কত কত জন্মে মশা মাছি হয়ে ছিলি, তা ফেলে এসেছিস্। একজনের যদি দশটা ছেলে থাকে, আর যদি বলি, ''দুটো ছেলে মারা গেলে ২০ হাজার জন্ম কাটবে; তা না হলে আরও ২০ হাজার বার জন্মাতে হবে, আর মরতে হবে।'' ২০ হাজার বার সংসার কি রকম? পর্দার একটু আড়ালে আছিস্। তাই বুঝতে পারছিস্ না।

জলটা যে খাচ্ছ, আমি যদি একটা যন্ত্র দেই, জল আর খেতে পারবে না। একটা যন্ত্রেই কিলিবিলি দেখবে। কত কিলিবিলি চলেছে, তার ইয়ত্তা নাই। বাতাসে কত কিলিবিলি করছে, নাকে কাপড় দিতে হবে। **নিজের জন্ম যদি দেখতে চাও, তুমি যদি চিন্তা কর, 'আর এক জন্মে কি করতে আছিলাম', তাহলে একটু যদি মোচড় দিয়ে দেই, মশা, মাছি, কাক, সাপ, ব্যাঙ থেকে শুরু করে কত কি দেখবে, ঠিক নেই। এই যে কত মশা মারছো, মাছি মারছো উদ্ধার পাবে না। তুমি তো চটাস্ করে একটা মশা মারলে। মনে একটা দাগ কেটে গেল। হয়ে গেল কিন্তু। একটা পিঁপড়া মারলেও মুক্তি নাই। বেদে খাওয়ার অধিকার আছে। মারার অধিকার নাই।**

তবে না মেরেও উপায় নাই। বাঁচার জন্য খেতে তো হবেই। শেষ তো হবেই। প্রকৃতি কেন আমাদের খাওয়া দিল? আরও নিম্নস্তরে যাওয়ার জন্য? এইসব দুষ্কৃতির মধ্যে ঢুকাবার জন্যই কি এসব দিল? আমরা মশা মারছি, পোকা মারছি, ডুবতে আছি। তবে এই অপরাধের হাত থেকে উদ্ধারের পথ কোথায়? **একই ইঞ্জিন হাজার হাজার বগি টেনে নিয়ে যায়। তাই বগি হয়ে ইঞ্জিনকে ধরে বসে থাকো, এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। স্মরণ মননই একমাত্র পথ।**

দৈনন্দিন জীবনে পাপ করছো, দুষ্কর্ম করছো, অপরাধ হচ্ছে। অপরাধ যে থট্ (চিন্তা)-এ আসে, বিনাশ করবার, অপরাধ মোচন করবার থট্-ও সেইভাবে আসে। কাজেই নষ্ট করার পথটা তৈরী করতে হবে। কামান দাগা শিখতে হবে। এই পথটা কি? ফ্লাড (বন্যা) যখন আসে, কামান দাগলে বেগটা কমে যায়। আমি জ্ঞানতঃ একটা গাছের পাতা ছিঁড়ি

নাই। কখনও কাউকে বলি নাই, 'অমুক মাছটা খাব।' জীবনে একবার ফুল ছিঁড়তে গেছিলাম, তাও ধরা পড়ে গেছি। হয়েছে কি, একবার দুর্গা পুজোয় পদ্ম ফুল লাগবে। আমাকে ফুল পাড়ার জন্য টিনের চালে উঠিয়ে দিয়ে, তারা নৌকা নিয়ে চলে গেছে। টিনের চালে উঠে সবে পদ্ম ফুলটা ধরেছি, আর টিনের শব্দ। আমি কইলাম, 'আমার দ্বারা হবে না'। তারপর যাদের বাড়ী, তারা আসছে— কে কে?

এই বাড়ীতে আমাকে নেবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে, আমি যাই নাই। আমি তো চিনি না। ওরা আসছে, কে কে?

আমি— আমি।

আমি কে? তারা এসে পড়েছে, 'গোঁসাইঠাকুর!'

আমি বলি, তোমাদের বাড়ী নাকি এটা?

তারা বলে, 'সকাল বেলা পাইছি। আর ছাড়বো না।' চোর ধরছে। ফলে হ'ল কি, যে বাড়ীর পুজো, সেখানে আর যাওয়া হ'ল না। এই বাড়ীতে ঠাকুরকে পেয়েছে। পুজোয় সেখানে সারাদিন কাটলো। খুব যত্ন টত্ন করলো। আর ওরা নৌকা নিয়ে সরে গেছে। এরা বিকেল বেলা নিজেদের নৌকা করে আমাকে পৌঁছে দিল।

কত সময় অনেকে দাঁত মাজে এই ডাল, সেই ডাল ভেঙে নিয়ে, আমি পারতাম না। আমি নিজে নিতাম না। কেউ দিলে নিতাম। স্কুলে যখন যেতাম, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, একবার দেখলাম, গাছে তিনটে আম পেকে আছে। ঝড়ে সব আম ফেলে দিয়েছে। হাঁটু পর্যন্ত সব আম পড়েছে। কিন্তু ঐ তিনটে আম ঠিক রয়েছে। বাবারে কইছি (বলেছি), ''ঐ তিনটে আম

পড়ে না কেন?''

বাবা বললেন, ''তুমি মন করেছ। কাজেই ঐ তিনটে আম রয়েছে। ও আর পড়বে না। কাকে খাবে।''

হলও তাই। পরে দুটো আঁটি পড়লো। ইচ্ছে আসাটা দোষণীয় নয়। তবে কাজে যেন না লাগে। প্রয়োগ না করলেই যথেষ্ট। জলের ফুটো হ'তে জল বের হবেই। বাজারে গেছি। বাবা মাছ কিনতে পয়সা দিতেন। আমি আরও পয়সা নিয়ে যেতাম। সব পয়সা দিয়ে কচ্ছপ কিনে কিনে জলে ছেড়ে দিতাম। কি সুন্দর সাঁতার কেটে কেটে চলে যেত। ওদের বলতাম, ''দেখ, খেয়ে আনন্দ, না ছেড়ে দেওয়াতে আনন্দ।'' তারা বলতো, ''তুমি ছেড়ে দিচ্ছ। আমরা তো আবার ধরবো''।

আমি বলতাম, ''না, এখানে আর ধরবি না।'' বাজারে গিয়ে খাঁচা থেকে পাখী কিনে কিনে ছেড়ে দিতাম। ওরা মুক্তাকাশে উড়ে যেত। আমিও অদ্ভুত আনন্দ পেতাম। এই যে চললো, এই ছেড়ে দেওয়ার আনন্দই আমি মনে মনে উপভোগ করতাম।

কারও অনিষ্ট বা ক্ষতির চিন্তা না করে, মনে মনে মননের সুরে যদি তৃপ্তির সুরটি খুঁজে নিতে পার, তাহলেই অনেকটা কাজ হয়ে যায়, বুঝতে পেরেছ? আজ এই থাক। রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

মহা সমাধির ইঙ্গিত স্বরূপ এই ঘুমের সমাধি, যার স্রোতে ফেলে দিলে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়

১৫৫, পার্কষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০১৭
২৬শে অক্টোবর, ১৯৬৯

বাঁকুড়াতে গিয়েছিলাম (২২শে ও ২৩শে অক্টোবর, ১৯৬৯)। বুধবার দুর্গাপুরে গেলাম। রাণীগঞ্জ হ'তে নন্দীগ্রাম হ'তে এসেছে, কীর্ত্তন করছে। আর এক জায়গায় নিয়ে গেল। অনেকে দীক্ষা নিল। মাষ্টার মশায়রা (শ্রীযুক্ত প্রকাশ বল ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন সাহা) ট্রেনে চলে গিয়েছিলেন। অনেক জায়গায় দীক্ষা দিতে দিতে দেরী হয়ে গেল। সেখানে ৩/৪টার সময় পৌঁছে আর দেরী করিনি। বরাবর মঞ্চে চলে গেছি। ওখানকার হেডমাষ্টার, শ্রীকমলেশ রায়চৌধুরী, আমার বাল্য বয়সের পরিচিত। ছোটবেলায় তাকে সোনাভাই ব'লে ডাকতাম। সে আমার থেকে ১০/১১ বছরের বড় ছিল। সে হ্যান্ডবিলে আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছিল। সেটা পড়ে সেখানকার লোকেরা বলেছিল, 'আপনি অনেক বাড়িয়ে লিখেছেন।'

সোনাভাই (কমলেশ রায়চৌধুরী) বলে, 'একটুও বাড়িয়ে লিখিনি। তিনি আসলে বুঝবেন।' আমার পক্ষে বিপক্ষে কয়েকটা Group হয়ে গেল। বড় বড় লাঠি নিয়েও কয়েকজন তৈরী ছিল। কিছুক্ষণ আলাপের পর বিপক্ষ দল একটু ঠাণ্ডা হ'ল।

আগের দিন রাত্রে তারা ঠিক করেছিল, একজন ক্যান্সার রোগীকে ভাল করে দিতে হবে। পরদিন সকালে সেই রোগীকে ডাকছে। সে আর উঠছে না। সে আর কোনদিন উঠবেও না। সেই ছেলে (ক্যান্সাররোগী) তো গেল। পরে তারা ঠিক করলো, গ্রামের একজন নাম করা ডাক্তার, পরোপকারী, তার প্যারালাইসিস্ হয়েছে, তাকে ভাল করে দিতে হবে। আমাকে বললো, "আপনি নাকি মরা মানুষ ভাল করে দিতে পারেন? এই ডাক্তারকে ভাল করে দিন। তিনি সুস্থ হলে আমাদের অনেক উপকার হবে। তাকে একটু বসিয়ে দিতে পারলেই হ'ল"।

আমি বলি, 'একটু বসিয়ে দিতে পারলেই হবে?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

৯০ ঘর ব্রাহ্মণ প্রথমে বাঁকা হয়ে বসেছিল। তারপর আস্তে আস্তে সবাই দীক্ষা নিল। দীক্ষা সমানে চলেছে। হাঁটা পথে, বাসে করে চতুর্দিক হতে লোক ছুটে আসছে। ৮০০ জনার নাম ওরা লিখতে পেরেছে। অনেক বাদ গেছে।

তারপর সেই ডাক্তারের বাড়ী গেলাম। তার আত্মীয় স্বজনরা চোখের জল ফেলছে। কলকাতার ডাক্তাররা বলেছে, 'এভাবেই ডাক্তারকে শেষ হতে হবে।' তার মেয়ে জামাই সীতারাম ওঙ্কারনাথ ও আরও অনেকের কাছে গিয়েছিল। ওঙ্কারনাথ বলেছে, যাতে চিরদিন ভাল জায়গায় থাকে, তার ব্যবস্থা করা হবে। ওরা ওখানকার (স্বর্গের) সুস্থতার কামনা করে। আমি আমার হাতের লাঠি দিয়ে একটু টোকাটুকি মেরে ডাক্তারকে বলি, 'এখন বসতে পারেন।' ডাক্তার উঠে বসলো।

সেখানে ‘রাম গুঁই’ নামে একজন ঠ্যাটা লোক ঠিক করেছিল, পারলে ওখানেই আমার মাথায় বাড়ি দেবে। তাকে বলি, ‘আর কি চাও?’ সে বলে, ‘‘আমি অন্যায় করেছি। এই ডাক্তারের কাছে আমি খুব উপকৃত। কাজেই তার অর্থাৎ ডাক্তারের যিনি উপকার করবেন, তিনিই আমার কাছে ভগবান। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।’’

আস্তে আস্তে সেই ডাক্তার নিজে নিজে গম্ভীরভাবে নীচে রাস্তায় আমার সাথে এল সিঁড়ি দিয়ে। সবাই অবাক হয়ে দেখছে। আশে পাশে ভিড় জমে গেছে। ডাক্তারকে বলি, ‘তোমার সাইকেল আছে? ইচ্ছা করলে সাইকেলে চড়তেও পার’।

ডাক্তার বলে, ‘‘আমি যদি এভাবে আসা যাওয়া করতে পারি, তাহলেই হবে।’’ তার বাসা থেকে সবাই বললো, ‘‘দীক্ষা নিলে এখনই নিয়ে নিন। তিনি এখনই চলে যাবেন। আর সময় নেই।’’

ডাক্তার এবং তার বাড়ীর সবাই দীক্ষা নিল। তারা পরে কমলেশ রায়চৌধুরীকে বলে, ‘‘আপনি কমই লিখেছেন। আরও বাড়িয়ে হ্যান্ডবিলে লিখতে পারতেন।’’ দীক্ষা সমানে চলেছে। ৯০ ঘর ব্রাহ্মণের মধ্যে আশেপাশে সব শেষ, দুই একজন যদি বাদ যায়। আর কয়েকদিন এখানে থাকলে, চিন্তা করলাম, কেউ বাকী থাকবে না। গ্রামকে গ্রাম যদি এভাবে একত্র করা যায়, তবে আর কোন রাজনৈতিক দল থাকবে না।

এরমধ্যে একটা দল, আমি যেখানে আছি, সেখান থেকে মাইল দশেক দূর হবে, ৫০/৬০ জন লোক, একটা কীর্ত্তনের

দল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই রাস্তা দিয়ে আমার যাওয়ার কথা নয়, সেখানেই তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন করছে আর ভাবছে, ‘তিনি যদি আসেন।’ যদি তিনি ভগবান হন, তাহলে ঠিক আসবেন। কারণ মহাপ্রভু ঐ পথ দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি সেখানে গেলাম। তাদের বললাম, ‘ঠিক হয়েছে তো?’

তারা বললো, ‘‘আমরা ১০০/১৫০ জন গ্রামের লোক বীরভূমের সব জায়গায় কীর্ত্তন করে ছড়িয়ে দেব। প্রভুর প্রচার করবো।’’

আমি বলি, ‘বেশ ভাল কথা। সময় হলেই হবে।’

দুই মাষ্টারমশাই, যারা গেছিলেন, এদিকে কমলেশ রায়চৌধুরী; আবার পুরুলিয়া হতে এসেছে বিনয় সোম (পুরুলিয়া, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের শিক্ষক), ৪০ বছর পরে তার সাথে দেখা। আমি, সোনা ভাই (কমলেশ রায়চৌধুরী), দুই মাষ্টারমশাই (শ্রীযুক্ত প্রকাশ বল ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন সাহা) ও বিনয় সোম— এই যে যোগাযোগ, এটাই অদ্ভুত হয়েছে।

এখানকার যারা বাসিন্দা, বেশীরভাগ কৃষিজীবি তারা এসেছে সব দীক্ষা নিতে। একবার দীক্ষা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে ২৫/৩০ জন কান পেতেছে। কাঁচি হাতে নিয়ে এসেছে। দীক্ষা দিলাম। কেউ কেউ বলে, বাবা, ‘‘কি বললে বুঝতে পারলাম না তো।’’ আমি আবার বলে দিলাম।

তারা বলে, ‘‘তোমাকে কি দেব বাবা, তুমি তো ভগবান’’।

আমি বলি, আমি তো কিছু জানি না।

তারা বলে, ‘‘বাবা, তুমি চলে যাচ্ছ যে। আবার আসবে

না?’’

যে ধান কাটছিল, কে এসেছে জানে না। তবুও কাস্তে ফেলে দিয়ে এসে দীক্ষা নিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাজার খানেক দীক্ষা নিয়ে গেল। তাদের একটা বুঝই আছে। তারা মহাপ্রভুর ভক্ত। সবাই কৃষ্ণ ভক্ত। অল্প সময়ের মধ্যে Arrangement, যা করেছে, তা যথেষ্ট করেছে।

ঘুমন্ত সমাধিতে আত্মোন্নতির পক্ষে কিভাবে সহজে কাজ হয়, সে (বিনয় সোম) তা বুঝে উঠতে না পারাতে, আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, “ঠাকুর, ঘুমন্ত অবস্থায় সমাধিতে কাজ যে সহজে হয়, তা কি করে বুঝা যায়?’’

তখন আমি বললাম, আমাদের শাস্ত্রে বা বেদে যা আছে, আর আজ এখন যা করছে, বেদ হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে। যাতে অতি সহজে সুস্থভাবে চিন্তা করতে পারে, সেই ব্যবস্থাই বেদে আছে। কাল বলেছি, আবার আজও একটু বলছি। ঋষিরা বলছে, অন্য গ্রহের লোকেরা আমাদের সম্বন্ধে ভাবছে, ‘‘এমন কোন এক গ্রহ আছে, এমন দেশ আছে, যেখানে অতি সহজে সমাধি আয়ত্ত করে ফেলেছে। নিশ্চয় তারা মহান।’’ আর ওরা সবসময় জেগে থাকে, ঘুমায় না।

সেই পৃথিবীর লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেছে, ‘‘এই পৃথিবীর লোক ১২ ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকে? নিশ্চয় তাদের উপর ভগবানের কৃপা আছে।’’ তারা স্বপ্ন দেখে। তারা গ্রহ গ্রহান্তরে যেতে পারে। সেই স্বপ্নের মন জাগ্রত অবস্থায় আনতে পারলেই হয়ে যাবে। এই পৃথিবীর লোক শুধু ঘুমায় না। হয়তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, আবার ঝিমাচ্ছে। নাকও ডাকছে।

তারা বলে, ‘‘এরকম সমাধি আয়ত্ত হয়ে গেছে? তবে আমাদের হয় না কেন?’’ তারা দিনের পর দিন চেষ্টা করছে। এক ঘণ্টা চক্ষু বুঁজে তারা শুয়ে আছে। তবুও তো ঘুম হয় না। নাক ডাকে না।

তখন বলে, ‘‘প্রভু, ৮/১০ ঘণ্টা শুয়ে আছি। তবুও তো ঘুম হয় না।’’

তাদের বলা হোল, ‘‘না খেয়ে থাক।’’

তারা ২/৩ দিন না খেয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, দেশের রাজা বলছে, ‘সকলকে খেতে হবে।’ খাবার এল। তারা ভয়ে ভয়ে খেয়েছে। তারপর জেগে উঠেছে। তারা বলে, ‘‘ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সব খেলাম। তারপর আমাদের জাগিয়ে দিল। মুহূর্ত্তে স্বপ্নে খাইয়ে দিল। স্বপ্ন দেখলাম, সব ভুলিয়ে দিল।’’

তাই বিনয় সোমকে বলেছিলাম, ‘দেখ, স্বপ্ন অবস্থায় মন স্বচ্ছ থাকে, পবিত্র থাকে। স্টোভে যতই তেল দাও, Poker-এর খোঁচা না দিলে জ্বলে না। সেইরূপ **তোমার ভিতরকার বিবেকরূপ, চৈতন্যরূপ Pin-কে জাগ্রত করতে হবে। তবেই নিদ্রারূপ সমাধিতে যে স্বপ্ন হয়, তাতে দর্শন হবে।** তুমি চিন্তা করে দেখতো, হঠাৎ একটা লোক অসুখ নাই, বিসুখ নাই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমাচ্ছে, নাক ডাকছে। সে বিলীন করে দিয়েছে নিজেকে। প্রকৃতি হতে এই ভাবকে সে সহজাত করে রেখেছে’।

বেদ তাই বলছে, ‘সমাধির জন্য তোমরা যে চেষ্টা কর, হঠযোগ, প্রাণায়াম, রেচক, পূরক, কুম্ভক ইত্যাদি বহু প্রক্রিয়ার দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করার জন্য যে চেষ্টা করছো, তা অত

করবার দরকার কি? আমি সহজে যে জিনিস দান করেছি, তাকে গ্রহণ করো।' তুমি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছ। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছ। আপন মনে ঘুমিয়ে পড়ে বলছো, "তুমি আজ যাও। কাল এস।" বন্ধু উঠে চলে গেল, "আচ্ছা ভাই। তুমি ঘুমাও।" বন্ধু যেতে যেতে দেখছে, তুমি ঘুমাচ্ছ।

কেন এই ঘুম? কেন এই বিশ্রাম? কেন এই আরাম? কোন্ প্রয়োজনে? এটা এক বৃহৎ সমাধির সূচনা মাত্র। কোন্ সমাধি? যে সমাধি হতে কোনদিন আর উঠবে না, এটা তারই ইঙ্গিত। একতিল একতিল করে করে এই ঘুম দ্বারাই শেষ ঘুম হবে। এটাই তার প্রাথমিক ধারা। এই ধারাতেই চলছে শেষ ঘুম। একতিল একতিল বালুকণা জমে জমে বৃহৎ বালুচর হয়ে যায়। জীবও এইভাবে একদিন চলে যায়। আর জাগে না। তাই ব'লে সে যে মৃত, একেবারেই নেই, তা নয়। প্রতিদিনের নিদ্রা, এই চিরনিদ্রার ইঙ্গিত। আজ তিনি কোন্ লোকে বিরাজ করছেন? চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে কোন্ লোকে চলে গিয়েছেন? এই যে বিচার করতে হবে, সেটার ইঙ্গিত হচ্ছে, প্রতিদিনের ঘুম।

স্বপ্ন দেখে না, এরকম ব্যক্তি খুব কম আছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে নানা জায়গায় যে বিরাজ করা যায়, সেতো আমরা জানি। স্বপ্নের বিষয়বস্তু বা ঘটনার আমি দাম দিচ্ছি না। তুমি ঘুমিয়ে যদি বেশী খেয়ে নাও, জেগে উঠে দেখলে, পেট ফেঁপে গেছে। ঘুমে যদি ভয় পাও, জেগে উঠে দেখলে, হাঁফাচ্ছ। স্বপ্নে যদি হিসি করতে যাও, জেগে উঠে দেখলে, বিছানায় হিসি করেছ। বাস্তবে যা অতি কঠিন মনে

হয়, স্বপ্নে তা অতি সহজে হয়। বাবা ঠাকুরদাকে দেখলে, তোমার সাথে কথা বলছেন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে ইঙ্গিত দিচ্ছে, মনে হয় যেন বাবা, ঠাকুর্দা চিরদিন আছেন। মৃত্যুতে চিরতরে বিলীন হয়ে যায় না বলেই বাবা ঠাকুর্দাকে দেখছো। তাঁদের অস্তিত্বের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক রয়েছে। অস্তিত্বের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে, এরূপ হয় না।

স্বপ্নে স্কুলের কথা, মাষ্টার মশাইদের কথা সব মনে হয়। তাঁরা যে নেই, ঘুমে তার খেয়াল থাকে না। স্বপ্নে গ্রামে যায়, বাজারে যায়। ছিলাম কলকাতায়, গেলাম গ্রামের স্কুলে। স্বপ্নে দেখছে, জলের উপর দিয়ে হাঁটছে। স্বপ্নে দেখছে, হুঁস্ করে শূন্যে উড়ে যাচ্ছে। কি সুন্দর সমাধি; তখন নির্বিকল্প অবস্থায় মন থাকে। **ঘোলাটে জল যদি Blotting Paper-এ রাখ, ঘোলাটে জল যদি বালির মধ্যে রাখ, ঘোলাটে জল আর থাকে না। দেখবে, স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। এই বাস্তবে ঘোলাটে যা কিছু আছে, স্বপ্নে তা ছাঁকনির মত হয়ে যায়, মনে রেখ।** এখানকার সন্দেহ, নানারকম দ্বন্দ্ব মনের ছাঁকনিতে গিয়ে পড়ে। তারপর ছাঁকনি হতে যেটা বের হয়, অতি Strong, অতি বিরাট আকার হয়ে যায়। দ্বন্দ্ব নেই, সন্দেহ নেই, অতি সুন্দর। তখন মনে দ্বন্দ্ব নেই বলেই, শূন্যের উপর দিয়ে হাঁটছো, আরও কত কি করছো।

বেদমন্ত্র........., বেদ তাই বলছে, 'তুমি কি করছো? তুমি স্বচ্ছ পবিত্র জল পাচ্ছ। তুমি যখন ঘুমিয়ে আছ, সেই বিরাট প্রকৃতি তোমার সত্তার সঙ্গে মিশবার জন্য, এই ঘুমের সমাধি দান করেছেন।' **অতি দুর্লভ বস্তু যাতে সহজে সহজলভ্য হয়, মৃত্যুর যে সমাধি, সেই চিরযুগের সমাধিকে লাভ করবার জন্য**

এইটা হ'ল প্রথম সিঁড়ি বা ভিত্তি। সেটাই হচ্ছে ঘুমের সমাধি; অতি সহজে আমরা প্রকৃতি হ'তে যে জিনিস পেয়েছি।

তাই বিষ্ণু দেবর্ষিকে বললেন, "তোমাদের কোন কিছু করবার দরকার নেই। যা তুমি সহজে পেয়েছ, তাতে নিজেকে ছেড়ে দাও।" ঘুমন্ত অবস্থায়, স্বপ্নের অবস্থায় মনের চিন্তার সাথে সাথে সাপ, বাঘ, বৃষ্টি— কত কি এসে পড়ে। স্বপ্ন হচ্ছে ইল্‌কি বিল্‌কি ঝিল্‌কি। স্বপ্নে কি হয়, স্বপ্নের বিষয়বস্তুর কথা বলা হচ্ছে না। কিন্তু স্বপ্নের সেই মনোবলটাকে নিয়ে এসে, যদি জাগ্রত অবস্থায় কাজে লাগানো যায়, তাহলেই হয়ে গেল।

কিছু লোক সাধনায় নিবিষ্ট হল। ঋষি তাদের বললেন, "স্বপ্ন অবস্থায় যে মন নিয়ে ধ্যান করছিলে, জাগ্রত অবস্থায় সেই মন নিয়ে বসে কাজ করো। মনের সেই ছবি তোল।" তারা ধ্যানে বসে ঝিমাচ্ছে। কাজ বেশী হয়ে গেছে। একজন ডাক দিয়েছে। তারা চটে গেছে। তারা বুঝতে পারছে, স্বপ্নে কাজ হচ্ছে। তারা ভাবছে, "স্বপ্নের এই অবস্থা যদি জাগ্রত অবস্থায় রাখতে পারি, তাহলে অনেক কাজ করতে পারবো"। তাদের মনে উথাল-পাথাল শুরু হয়ে গেছে। কি করে স্বপ্নের মনের মাত্রার সাথে জাগ্রত অবস্থা এক করে দেওয়া যায়, তার চেষ্টা করছে। একদিন ঘুমে দেখে, বৃষ্টি হচ্ছে। আবার জেগেও দেখে, বৃষ্টি হচ্ছে। পরে বলে, 'থাম্ থাম্।' বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। তাদের সকলের মধ্যে শক্তি জেগে উঠছে। যে ক্ষেতে 'জল নেই', 'জল নেই' বলে হাহাকার লেগে গেছে। সব শস্য শুকিয়ে যাচ্ছে। তারা বলাতে জল এল। সবাই ভাবতে শুরু করেছে। ৫ মণের জায়গায় ৫০ মণ শস্য উৎপন্ন হচ্ছে। কোন অভাব নেই।

তারা আনন্দে বলছে, "আমরা অনন্ত মহাবল পেয়েছি। সেই বল (শক্তি) খাটাচ্ছি।" সবাই দেখে, চালে ডালে চারিদিক দিয়ে খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তারা একদিন সবাই বসে বসে ভাবলো, "সব যদি এখন আগুন লেগে যায়।" সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে গেল। তখন সবাই চিৎকার করে ঋষিকে বলছে, "বাঁচাও"।

ঋষি বলছেন, "কেন তোমরা তোমাদের শক্তিকে চালে ডালে লাগাতে গেছ? সব ছেড়ে এখন তোমরা জপ ধ্যানে বসে যাও।" এইজন্যই দেখ, সবকিছুই check করবার ব্যবস্থা আছে। শরীরের কোন আঙুল ধরে মোচড় দিলে আমরা উঃ করি। এই ব্যথাটা হচ্ছে মাত্রা, Balance. প্রত্যেকটি শক্তির একটা মাত্রা আছে। সেটার বাইরে গেলেই মুস্কিল। **তোমাদের আজ্ঞাচক্র (ত্রিনয়ন) যদি খুলে যায়, অন্তর্যামিত্ব যদি এসে যায়, তাহলে কাকেও সাপ দেখবে, কাকেও ব্যাঙ দেখবে, কাকেও কাক দেখবে। তখন কারও সঙ্গে মিশতে পারবে না, কোন অবস্থায় কোথাও যেতে পারবে না। সেইজন্য যেন seal দিয়ে আটকিয়ে রেখেছে। গুরু যখন দেখেন, তৈরী হয়েছে, তখন seal-টা খুলে দেন। কাজেই না বুঝে আছ বলেই তোমরা ভাল আছ।** সৃষ্টির নিয়মে যেখানে যেখানে আটক রাখা দরকার, যেখানে যেখানে বাঁধ থাকা দরকার, নিয়মমাফিক দিয়ে গেছে।

বিরাট বিরাট সাধকেরা, যোগীরা ঘুমের মধ্যে যেভাবে নাম করেন, ঘুমের বাইরেও সেভাবে কাজ করেন। মহাপ্রভু ঘুমের মধ্যে নাম করতেন, জেগেও সর্বদা নাম করতেন। ঐ ধ্বনিতে ধ্বনিতে আসে-পাশের সব লোক শুনতো কীর্ত্তন। তিনি যেখানে যেতেন নাম চলতো, কীর্ত্তন চলতো। এতে তাঁর

ভিতর যেসব কোটি কোটি অণুপরমাণু ছিল, সবাই নাম করতে শুরু করেছে। কীর্ত্তন তো আমার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) ভিতরেও চলছে। একথা বলে আবার ফ্যাসাদে পড়বো নাকি। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীব (অণু-পরমাণুর আকারে) তো আছে প্রতিটি মানুষের মধ্যে। তারা সবাই (আমার মধ্যে) নাম করতে শুরু করেছে। মহাপ্রভু নিজের মধ্যে লীন হতেন; আবার প্রকাশ হতেন। তিনি একবার ভগবান হচ্ছেন। আবার ভক্ত হচ্ছেন।

ভক্ত হরিদাস কেন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন? তিনি মহাপ্রভুর বুকে একটু মালিশ করতে গিয়ে দেখেন, তাঁর ভিতর থেকে অবিরাম ধারায় স্রোতের মত অনর্গল ১৬ নাম ৩২ অক্ষরের নাম এবং সুর বের হচ্ছে।

হরিদাস তখন মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘প্রভু, এটা কি বের হচ্ছে?’’

মহাপ্রভু— এটা শুধু আমার মধ্যে নয়। জগতের সবার ভিতরে এই নাম এবং সুর চলছে। আকাশে বাতাসে অবিরাম এই সুর চলছে। কেউ শুনতে পায়, কেউ পায় না। তুমি যে শুনতে পেয়েছ, তোমার যন্ত্র খুলে গেছে। তাই তুমি বুঝতে পারছো। হরিদাস, তুমি নামে ডুবে থেকো।

সেইদিন থেকে ভক্ত হরিদাস কুঁড়ে ঘরের মধ্যে বসে ২০/২১ ঘণ্টা নাম জপ করতে শুরু করলেন। তিনি প্রতিদিন ৩ লক্ষ নাম জপ করতেন। তিনি যেন শুনতে পেতেন, তাঁর নামের সাথে সাথে শত শত, হাজার হাজার খোল করতাল মৃদঙ্গ নিয়ে সবাই নাম করছে। একদিন তিনি দেখলেন, ভগবান বিষ্ণু তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আবার দেখলেন, মহাপ্রভু

কখনও বিষ্ণু হন, আবার কখনও সাধারণ মানুষ হন।

তাই তোমরা আর কিছু নয়, তোমরা জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়। আবার জপ করতে করতে জাগো। তোমার মনের ক্যামেরার লেন্স তোমাকে ক্ষমা করবে না। তুমি যা করবে, ঠিক তার ছবি তুলে নেবে। তোমার বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল মন। নানারকম ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির তাড়ণায় মন চঞ্চল হয়ে যায়, তাতে কিছু আসে যায় না। **স্বয়ং স্রষ্টা দান করেছেন এই ঘুমন্ত সমাধি। মহাসমাধির (মৃত্যুর) ইঙ্গিতস্বরূপ এই ঘুমের সমাধি, যার স্রোতে ফেলে দিলে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই মহাতীর্থের সিঁড়ি হচ্ছে এটা।** হোক বা না হোক, মন বসুক বা না বসুক, তুমি চেষ্টা করে যাও। তুমি শুধু ভাব, ‘ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জপ করবো’। একদিন তোমাকে টক্ করে নিয়ে যাবে। লেন্সের এত ক্ষমতা টক্ করে নিয়ে নেয়। তোমার চেষ্টার চেয়ে কোটি গুণ তোমাকে টান দিচ্ছে। তোমার চেষ্টা তার কাছে একটা কণামাত্র। যোগাযোগ করে দেয় সেই সমাধি। কখন তোমার চেষ্টা সেই পথে আসবে, তারজন্য সমাধি চুপ করে থাকে। চুম্বকের টানে যেমন জাহাজ চলে আসে, সেই ঘুমন্ত সমাধিতেও তোমাকে টেনে নিয়ে আসে। ঘুমের মধ্যে সেই সমাধিতে ভেজাল থাকে না। স্বপ্ন দেখলে মনটা filtered হয়ে যায়।

হরিদাস জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিষ্ণু এসে বলছেন, ‘হরিদাস, তুমি নাম করছো?’

হরিদাস— হ্যাঁ, প্রভু।

বিষ্ণু — তুমি যখন নাম কর, আমি ছুটে আসি। তুমি

পাপী নও, তুমি মুক্ত।

হরিদাস — আমি যেন গুরুকৃপায় আজ্ঞাচক্রে সহস্রারে তোমার দর্শন লাভ করতে পারি।

বিষ্ণু — তথাস্তু।

হঠাৎ হরিদাস জেগে উঠে দেখে, হরি চলে যাচ্ছেন। তখন হা হরি, হা কৃষ্ণ ব'লে চিৎকার করছে।

বিষ্ণু— হরিদাস, তুমি এগিয়ে যাও। ভয় নেই।

এইভাবে হরিদাস সুর পেয়ে গেছেন। স্বয়ং বিষ্ণু তাকে আশীর্বাদ করে গেছেন স্বপ্নে। তাই জেগেও তিনি বিষ্ণুকে স্মরণ করে নামে ডুবে গেছেন। এর আগেও হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ নাম করেছেন। আবার স্বপ্নের পর এই হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ করতে করতে চললেন পথে প্রান্তরে। এইভাবে হতে হতে তিনি নামে মিশে গেলেন। তখন দেখা গেল, বর্ষাকালে কোন্‌টা খাল, কোন্‌টা নদী, যেমন বুঝা যায় না, সব জলে জলময় হয়ে যায়; বন্যা যখন আসে, সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মহাপ্রভুর নামের বন্যায় সব ভেসে গেল।

তোমরা ভুল করো না। তোমাদের মনের আবিলতার জন্য নানারকম ক্লেদ পঙ্কিলতা আসবে। ওটাও ঘুমের মাঝে ছাঁকনিতে পড়ে নিত্য পবিত্র শুদ্ধ বুদ্ধ অবস্থা করে তুলবে। তাই বিষ্ণু সমস্ত লোককে বললেন, 'হে জীবলোক, তোমরা নাম করে যাও।'

বিষ্ণু দেবর্ষিকে বললেন, "হে দেবর্ষি, তোমার আর অন্য কোনকিছুর প্রয়োজনীয়তা নেই। (বেদমন্ত্র...) তুমি যে আজ

দেবতার স্থানে চলে যাচ্ছ, হে দেবর্ষি, কারণ তোমার স্বপ্ন সফল। তুমি সহজ সমাধিকে জয় করে ফেলেছ। **মৃত্যুর কবলে তুমি আর পড়বে না। মৃত্যু তোমার হবে। তবে আর তুমি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হবে না। মৃত্যুর কবলে তখনই তারা আসে, যখন ৬০/৬৫/৭০ বৎসর বয়সে এই ঘুমের সমাধিকে কাজে লাগাতে পারে না। প্রতিদিনের ঘুমের সমাধির মাঝে যেতে যেতে চিরনিদ্রায় যে অভিভূতের সমাধি, এটা মৃত্যু নয়। এটা চির নির্বিকল্প সমাধির মতো।** যখন দেবলোকে যেতে থাকবে, তখন বুঝতে পারবে জীবের ভুল। মৃত্যুর সমাধির ভেলায় যখন যাবে, তখন মহাস্বাদের স্বাদ উপলব্ধি করবে।"

স্রষ্টা বলছেন, তুমি যখন 'এক' গণতে পার, তুমি অগণিত গণতে পার। গণনা যখন তোমার হাতে, তুমি যদি শুধু ১/২ গুণে বসে থাক, এটা কার দোষ, দেবর্ষি? অগণিত গণিতের গণনা, সেই গণনা তোমার হাতে, সেখানে ১/২ করে গণনাতেই তো অসুবিধা। **যে জিনিস প্রকৃতি দিয়েছে প্রতিদিনের ঘুমের মাঝে, এতেই নির্বিকল্প, নির্বাণ সব পাবে। বিচলিত হয়ো না। তোমরা ভুল করো না।**

দেবর্ষি— আমরা বুঝেও তবু প্রতিমুহূর্তে কেন ভুল করি?

বিষ্ণু— তোমার ভুল যখন বুঝেছ, তখনই বুঝবে, তোমার ভুল শুদ্ধ হয়েছে। আমি অঙ্ক যখন করবো, ভুল যদি ধরতে পারি, ভুল আর থাকে না। কারণ প্রতিদিনের ঘুমন্ত সমাধি, স্বপ্ন-সমাধি জানিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে, কোন্‌টা ভুল।

তখন দেবর্ষি বলছে, আমার ভুল আমি বুঝতে যে পারছি, জগতে সবার ভুল যে সবাই বুঝতে পারছে, এতেই যথেষ্ট। এইভাবে বুঝে বুঝেই আমরা যেন তোমার কাজ করে যেতে পারি।

বিষ্ণু— দেবর্ষি, কি হচ্ছে না হচ্ছে, তাকাতে যেও না। তুমি শুধু সেই ঘুমন্ত সমাধির সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে, নিজের নিদ্রিত দেহটাকে শব মনে করে, সেই শবাসনে শবের সাধনা কর। মা কালী যেভাবে শিবের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন; সেই মঙ্গলের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন মা শক্তিরূপিনীরূপে। তুমি সেইভাবে শবের সাধনা কর। সেই শবই সব। সেই সারের উপর তোমরা দাঁড়াও। খোদার ষাঁড়ই খোদাকে (শিবকে) বহন করছে। তোমরা সেই সারই বহন কর। তোমরা সেইভাবে থাক। তোমাদের আপনি ফুটবে। ফুটবার জন্যই প্রকৃতি সেইভাবে সব দান করেছেন। তাই ঘুম সমাধির মধ্য দিয়ে সাধনা করতে হবে। এই ঘুম সমাধি সাধনার চাবি কাঠি। তাই তোমাদের হবেই। তোমাদের শান্তি হোক।

দেবর্ষি তখন দেখলেন, প্রতিদিনের এই ঘুমন্ত সমাধি, এই সাধারণ সমাধি এত বিরাট। প্রকৃতি এই বিরাট সম্পদ আমাদের দান করেছেন অতি সহজভাবে। ‘‘আমরা যেন কোনভাবেই তাকে অবহেলা না করি। তার সদ্ব্যবহার যেন করতে পারি,’’ প্রভুর কাছে এই প্রার্থনাই জানালেন দেবর্ষি। আজ এই থাক। রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

প্রতিদিনের ঘুম আমাদের একটু একটু করে, মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

পার্ক স্ট্রীট,
৩রা মার্চ, ১৯৬৮

এই রাম নারায়ণ রাম ধ্বনি, নাদধ্বনি সর্বত্র বিরাজমান। সৃষ্টির আরম্ভ থেকে এই নাম, এই ধ্বনি আকাশে বাতাসে সর্বত্র বিরাজ করছে। যত বিরাট ঋষি মুনি ভূলোকে এসেছেন, সেই বিরাট পুরুষরা, সেই বিরাট সত্যবানরা এই নাম এই ধ্বনি শ্বাসে প্রশ্বাসে আকাশে বাতাসে শুধু করে গেছেন। এই নাম আজও জলের মত বয়ে চলেছে আকাশে বাতাসে আপনমনে। আমাদের শ্বাসে প্রশ্বাসে এই ধ্বনি প্রবাহিত হচ্ছে। ঐ নামকে, ঐ ধ্বনিকে, ঐ সত্যবস্তুকে আয়ত্ত করতে হলে, করতে হবে এই নাম সংকীর্ত্তন মিলিতভাবে। এই নাম গুরুগম্ভীর স্বরে চিৎকার করে করতালির ধ্বনির সঙ্গে, সকলের সাথে এক মিলনের সুরে, করতে হবে। ঐ মহাকাশের মহানাম রাম নারায়ণ রাম ধ্বনির সঙ্গে প্রত্যেকের কীর্তনের ধ্বনি, এক ধ্বনি করে মিশিয়ে দেবার আকাঙ্খায় করে যাবে। কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। দেবতারা, ঋষিরা, অবতাররা আকাশে বাতাসে এই মহানাম ছড়িয়ে গেছেন। সিদ্ধির পথে, মুক্তির পথে পৌঁছাবার জন্য, তোমাদের ইহা (মহানাম) দিয়ে গেছেন।

তোমরা বাতাস যেমন টান, তেষ্টা পেলে জল যেমন খাও, তেমনিভাবে এই মহানাম, মহাধ্বনি করে যাবে। আমাদের শিরা উপশিরার মাধ্যমে আজ্ঞাচক্রের ভিতর দিয়ে এই নাম

আপনি বয়ে যাচ্ছে। আমাদের জীবনযাত্রায় বাঁচবার জন্য যেমন বাতাসের প্রয়োজন, ঠিক সেইভাবে এই মহানামেরও প্রয়োজন। যেভাবে বাতাস এসেছে, জল এসেছে, যেভাবে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু এসেছে, যেমনি করে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত বিষয়বস্তু গড়া; যেমনি করে সব অবগত হওয়া যায় পূর্ণভাবে; তেমনি করে এই বিশ্বের সবকিছুকে বোধে এনে যাতে বোধগম্য হয়, তারজন্যই মহানরা দিয়ে গেছেন ঐ ধ্বনি। ঐ যে সংকেত ধ্বনি বিশ্বের মধ্যে রয়েছে, তাকে শুধু তোমরা জেনে নাও। এই ধ্বনিত বস্তুকে তোমরা জেনে নাও। সেই ধ্বনিকে বুঝে নাও। সেইভাবে সংকীর্তন কর। সেইভাবে ধ্বনিকে ধ্বনিত করো তোমার দেহবীণাযন্ত্রে। সেইভাবে সুর দিয়ে তোমরা সুরকে আয়ত্ত করো। জল যেমন আমরা পাই, বাতাস যেমন আমরা পাই, আলো যেভাবে খুঁজে পাই, সূর্যের আলো যেভাবে পাই, তেমনি এই মহাধ্বনি, মহানাম আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা সহজভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তার সাথে সম্পর্ক রাখছি। ঐ সমস্ত শূন্যের বিষয়বস্তু নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। ঐ ধ্বনিকে অবলম্বন করে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। যদি আমরা সেই ধ্বনিকে আপন মনে টানি, যদি উচ্চৈস্বরে আপনমনে বলি, যদি অবিরতভাবে, অনর্গলভাবে সবসময় আমরা নাম করি, কাজকর্মের ভিতর দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাসের মতো নাম করে যাই, তাহলেই টেনে নিতে পারবো।

সবসময় যদি নাম করা যায়, সবসময় যদি ধ্যানে থাকা যায়, সংসারের কোন কাজকর্ম নষ্ট হবে না। খনন করলে যেমন জল আসে, সেই যে অফুরন্ত শক্তি, সেই নামের চিন্তাধারার জগতে, ধ্বনির জগতে ছড়িয়ে আছে। সেটা যখন আমাদের

ভিতর বইতে থাকবে, যখন আমাদের ভিতর স্ফূরণ হবে, আপনি বুঝতে পারবে। ঘুমিয়ে থেকে যে নাম, জেগে থেকে যে নাম, যখন এক হয়ে যাবে— তখন শয়নে স্বপনে জাগরণে সবসময় চলবে ঘড়ির মতো টিক্ টিক্। তাই বলা হয়েছে, জাগ্রত বস্তুর মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থার মাত্রা টেনে আনো।

আমাদের প্রতিদিনের যে ঘুম, এই ঘুম আর কিছু নয়। এই ঘুম হচ্ছে সমাধি। এত সহজ সমাধি— আমরা একে দাম দিই না। স্রষ্টা সহজাত বস্তুরূপে এতবড় সমাধিকে, এমন সুন্দর বস্তুকে আমাদের ভিতরে দান করেছেন। এই ঘুম শত্রু নয়। এই ঘুম হচ্ছে মহা সমাধি। চিরদিনের সাথীরূপে ঘুমাতে ঘুমাতে এই ঘুমকে আশ্রয় করে একদিন শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হবে। এই ঘুমের দ্বার দিয়েই শেষ মুহূর্ত্তে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এই সমাধিকে আমরা এত সহজে পাই; কোন চেষ্টা করতে হয় না। অথচ সাধকরা জাগ্রত অবস্থায় এই ঘুমের মাত্রা পাওয়ার জন্য, চেষ্টা করছে আপ্রাণভাবে। প্রকৃতির বিরাট দানস্বরূপ এই সমাধি পেয়েছ। এই সমাধিকে তোমরা কাজে লাগাও। কতদিন বলেছি, ঘুমিয়ে নাক ডাকছে, নির্জন নির্বিকল্পে। তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ সমাধি শবাসনে। সেটা হ'ল ঘুমন্ত সমাধি।

তোমার চিন্তাধারার ধারা কতরকম। কত কিছু দেখে হয়তো মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হোক্, তাতে কিছু আসে যায় না। আগে দখল কর এই দেহক্ষেত্রের সমাধিকে। বাইরের জমি নয়। নিজ দেহের এই সাড়ে তিন হাত জমির অভ্যন্তরে সমাধিকে আগে দখল কর। তারপর যুদ্ধ করো। সেখান হতে প্রেম ভালবাসা সর্বত্র ছড়িয়ে দাও। ঐটুকু বাদ দিয়ে তোমার আর কোন পরিচয় থাকবে না। এই মহাসমাধির সাড়ে তিন

হাত জায়গা আগে দখল কর। এই সাড়ে তিন হাত জায়গাকে দখল করতে হলে, ঐ সমাধিকে আশ্রয় করে, ঐ ঘুমন্ত সমাধিকে কাজে লাগাতে হবে। সৃষ্টির সহজাত বস্তুর মধ্য দিয়েই আমাদের চেষ্টা করতে হবে। অযথা সময় নষ্ট করার সময় নাই। ৬০/৬৫ বছরের পরমায়ু। আমরা প্রকৃতি হতে এমন মূল্যবান জিনিস পেয়েছি, তা যেন নষ্ট না হয়। তাই ঘুমাতে যখন যাবে, জপ করবে। এই জপ, এই নাম যেন ঘুমের মধ্যেও থাকে। তখন দেখবে, ঘুমন্ত অবস্থায় এবং স্বপ্নেও তুমি কাজ করছো। মনে কর, তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ৫/৬ ঘণ্টা কীর্তন করছো, জপ করছো, অনেক কাজ হয়ে যাবে। ফল হবে তখন, যখন ঐ সমাধিকে তুমি আয়ত্ত করতে পারবে। যখন ঘুমিয়ে থেকেও বুঝতে পারবে, স্বপ্নের মধ্যে তুমি জেগে রয়েছ। কিন্তু তোমার দেহ সমাধিতে আছে। তুমি হয়তো ভাবছো, 'আমি তো ঘুমাচ্ছি। দেহ তো পড়ে রয়েছে।' তখন মনে পড়ে যাবে, 'আদেশ আছে। আমি এখন জপ করবো।' সেই যে কাজ, ঘুমন্ত অবস্থায় জপের যে ফল, প্রতিদিন ৭/৮ ঘণ্টা একসাথে বসে জপ করলে যে ফল না হয়, মুহূর্ত্তে সেই ফল পেয়ে যাবে। তিন দিনে তিন বছরের কাজ, পাঁচ দিনে পাঁচ বছরের কাজ হয়ে যাবে। প্রতিদিন যদি এক বছরের জপের ফল পেয়ে যাও, তাহলে তোমার কত কাজ হয়ে যাবে, চিন্তা করো তো। এক জীবনে যদি ২০০ বছর/৪০০ বছরের কাজ করে যেতে পার, তাহলে আর ভাবনা কি? এই ৪০০ বছরের কাজ করতে গেলে কত জন্ম নিতে হতো।

প্রথম প্রথম বাধা আসবে। অনেক অসুবিধা হবে। বাধা আসুক, যাই হোক। ঘুমন্ত অবস্থার সমাধিটা জাগ্রত অবস্থায়

আনবার চেষ্টা করাটাই একমাত্র কাজ। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে অনেককে দেখা যায়। যারা চলে গেছেন, তাদের সাথে দেখা হয়। জাগ্রত অবস্থায় তাদের কথা মনে থাকে। দাদু মারা গেছেন। আবার কি যেন বলে গেলেন ঘুমের মাঝে। জেগে উঠে সেটা তোমার মনে হলো। এইরকম ঘুমিয়ে থেকে যেটা জানলে, জেগে সেটা তোমার মনে হলো। এটাই পূর্বজন্ম, পরজন্ম। জেগে যাওয়ার সাথে সাথে, জন্ম হওয়ার সাথে সাথে জেনে গেলে আগের জন্মের কথা। এইভাবে বহু জিনিস জাগ্রত অবস্থায় বলা যায়। এইভাবে স্মরণ করে করে বহু জন্মের কথা বলা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ সীমাবদ্ধের মধ্যে জীবকে রেখে দেওয়া হয়েছে।

দেখা গেছে, ঘুমিয়ে আছে। স্বপ্নে দেখছে, আরেক জায়গায় আছে। সেখানে সংসার ঘরবাড়ী করছে। সেখানে ঘুমিয়ে আবার স্বপ্ন দেখছে, আর এক জায়গায় আছে। এইরকম সমাধি হতে হতে শেষবেলায় দেখা যাচ্ছে, বহুযুগের কথা টেনে আনছে। বহুযুগের কথা মনে আসছে। তাই মনে রাখতে হবে, এই ঘুমন্ত সমাধি হচ্ছে, বিশ্ববিরাটের বহু জিনিস টেনে আনার যন্ত্র। স্রষ্টা শুধু ঘুমাবার জন্য তোমায় পাঠিয়ে দেন নি, 'যা বেটা, কেবল ঘুমা।' অনেকের আবার স্বপ্নে খেলে পেট ফাঁপে। আমার এক মাষ্টার মশাইকে স্বপ্নে ছোবল দিয়েছে। জেগে দেখে, রক্ত বেরিয়ে গেছে। একজনকে আবার স্বপ্নে রোজই পোলাও, মাংস খাওয়ায়। সে জেগে উঠে আর খায় না। বলে, 'এত খাওয়া যায়।' স্বপ্নে বদহজম হয়; বড়ি খায়। মাথার কাছে অনেক ওষুধ রেখে দেয়। সে রাত্রে না খেয়ে শোয়। খেতে ডাকলে বলে, 'রাত্রে আমি তো খাই। আজ আর খাব না।' স্বপ্নেই ভুবনেশ্বর

(আয়ুর্বেদিক বটিকা) খায়। তাতেও পেট ফাঁপা রয়েছে। দেখ, এমন হয়। অদ্ভুত! আমার বয়স তখন ১০/১২ বছর। এভাবে স্বপ্নে বহু কাজ করিয়েছি।

কেন ঘুম আসে? কেন ঝিম আসে? শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অণু-পরমাণু সাড়া দিয়ে যাচ্ছে, 'সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। কাজেই তুমি সত্যবস্তুকে টেনে আন তাড়াতাড়ি।' বিশ্ব বিরাটকে পাবার জন্যই এই ব্যবস্থা। আমাদের যেমন ক্ষুধা পায়, তেমনি বিশ্বের সুরকে জানবার জন্য সত্যবস্তুর চাহিদায়, ভিতরের অণুপরমাণু যখন চাহিদার জিনিস না পায়, তখন ঝিমিয়ে পড়ে। বিশ্বপ্রকৃতি যে কারণে সৃষ্টি করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই কারণের সঙ্গে যুক্ত না হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ঝিমানি থাকবে। যেমন হাওড়া ব্রীজ রয়েছে এপার থেকে ওপারে যাবার জন্য। তেমনি এই সমাধির ব্রীজটা, বিশ্ববিরাটের এই ব্রীজটার মাধ্যমে এপার থেকে ওপারে যাবার ব্যবস্থা রয়েছে। এর মাধ্যমে বছরকে মুহূর্ত্তে পেয়ে যাচ্ছো। যখন তোমরা এই সমাধিতে গিয়ে পৌঁছাবে, তখন মুহূর্ত্তে কাজ হয়ে যাবে। কাউকে হয়তো বাঘে বা সাপে তাড়া করেছে ঘুমের মধ্যে, সে শূন্যে উঠে গেছে। তার ভিতরে এমন একটা মনোবল সৃষ্টি হয়েছে যে, মুহূর্ত্তে শূন্যে গমনের সাধনার ফলটা পেয়ে গেছে। এই যে মাত্রাটা, যেই মুহূর্ত্তে মনে হল, 'আমি উঠছি', ঐ মাত্রাটা জাগ্রত অবস্থায় ধরে রাখতে পারলে জাগ্রত অবস্থায়ও শূন্যে উঠতে পারবে। ঘুমের অবস্থায় মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না। মন থাকে আকাশের মতো স্বচ্ছ, নির্ম্মল। স্বপ্নে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকে না। স্বচ্ছ ভাবটা সমাধিতে থাকে। দ্বন্দ্ববিহীন ঐ অবস্থাটা যদি জাগ্রত অবস্থায় maintain করা যায়, তবে যে কোন মুহূর্ত্তে যা ইচ্ছা

তাই করতে পারবে। ঐ স্বচ্ছ অবস্থাটা যদি জাগ্রত অবস্থায় থাকে, তবে এমন একটা দিন আসবে, বর্ষায় যেমন খাল বিল সব এক হয়ে যায়, জাগ্রত অবস্থা আর সমাধি (ঘুমন্ত অবস্থা) অবস্থা এক হয়ে যাবে। জাগ্রত অবস্থায় যখন স্বপ্নের অবস্থা আসবে, তোমার মধ্যে তখন সমাধি খেলতে থাকবে। জাগ্রত অবস্থায় যখনই টানবে, স্বপ্নের অবস্থা তখনই তোমার মধ্যে এসে যাবে। প্রকৃতির যে উদ্দেশ্য, সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য, তখনই তার সার্থক রূপায়ণ হবে। তাই ডিম ফুটানোর জন্য যেমন তাপের দরকার, সেই তাপটুকুই তোমাদের প্রয়োজন।

রোজই যখন ঘুমাবে, তখন স্মরণ করবে, প্রতিদিন ঘুমের মাধ্যমে আমাদের মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এটা বিশ্রাম নয়; এটা (ঘুম) আরাম নয়। এটা শুধু মৃত্যুর দ্বার। মৃত্যুর দ্বারের দ্বারীরা, মৃত্যুপথের পথিকরা প্রতিদিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যেই পথ মৃত্যুর পথ, সেই পথ আবার সিদ্ধির পথ, সেই পথ মুক্তির পথ। সেই পথ বিশ্বস্রষ্টার মুক্তির পথ। ঘুমন্ত অবস্থায় শিশু যখন মাতৃগর্ভে ছিল, সেটাই হ'ল ঘুমন্ত সমাধি। সেই সমাধির অবস্থায় কুণ্ডলী পাকিয়ে মণিপুর দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করতো। এই নাভিমূল দিয়ে, শিরা উপশিরা দিয়ে, প্রকৃতির মাতৃ অঙ্গের সঙ্গে জড়িত ছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় শিশু মৃত্যুর সাথে সাথী হয়ে, জাগ্রত অবস্থাকে দখল করেছে। নাভিমূলে খাদ্য সঞ্চয় করে, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মুগ্ধ করে, এক নিগূঢ়তম অবস্থায় রেখেছে। এইজন্য নাভিটা পুড়ে যায় না। তা না হলে, শিশু এই সমাধিস্থ অবস্থায় না থাকলে, দশমাসের বাচ্চা কেহ পেটে রাখতে পারতো? যদি পেটের মধ্যে বাচ্চা হুলুস্থূলু করতো, মায়ের কি অবস্থা হতো?

প্রকৃতির সত্তার সাথে একই সত্তায়, শিশু ঘুমিয়ে থাকে মাতৃগর্ভে। বিশ্ববিরাটের স্যাম্পেল হিসাবে মাতৃগর্ভের এই সমাধি। এটা হচ্ছে নমুনা; ফ্যাক্টরীর স্যাম্পেল। ওটা বিরাট ফ্যাক্টরীর নমুনা। সেইভাবে সমাধি অবস্থায় বাচ্চা ঘুমায় মাতৃগর্ভে। তাই প্রকৃতি বলছেন, "ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। মৃত্যুর পথের পথিক হিসাবে এগিয়ে দিচ্ছি। তোমার ইন্দ্রিয়ের বেগ যেমন রয়েছে; ঘুমের ক্ষুধাও রয়েছে।" ঘুমের ক্ষুধার নিবারণ করতে বলছেন প্রকৃতি, "খালি পেটে তাকে রেখো না। তার খাদ্য কি? ধ্বনি।"

তাই নাসার (নাসিকার) ধ্বনি ঘুমন্ত অবস্থায়। এমনি দশ মিনিট চেষ্টা করে নাক ডাকলে, নাক দিয়ে রক্ত বের হয়ে যাবে। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ৪/৫ ঘণ্টা নাক ডেকে চলেছে আপনমনে। টেপ রেকর্ডে সেই শব্দটা ধরে, রেখে দেওয়া যায়। ঘুমের মাঝে সহজভাবে নাসিকার মাধ্যমে সেই শব্দটা করে যাচ্ছে। জীব যখন ঘুমিয়ে থাকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দরজাগুলো আল্‌গা থাকে। আর একটা দরজা খুলে যায়। এমন একটা অবস্থা আসে তখন, ঘুমন্ত অবস্থায় তার ভিতর দিয়ে যা কিছু হয়, সব অসম্ভবই সম্ভব হয়ে যায়। আমাদের অত শত চিন্তা করার প্রয়োজন নাই। কেবল ঘুমিয়ে কীর্ত্তন কর, জপ কর। তাই আমাদের কাজ। ঘুমের যে সমাধি রয়েছে দৈনন্দিন— তাকে কাজে লাগাও।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

চলার পথে যে অজানা, তাও সমাধি।

রাজা বসন্ত রায় রোড
৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩

প্রকারান্তরে সর্ব অবস্থায়ই আমাদের ভিতর একজাতীয় সমাধির অবস্থা বর্ত্তমান রয়েছে। বুঝা যায় না। বুঝলেও বলতে ভাল লাগে না। একজন কথা বলছে, আর একজন উত্তর দিচ্ছে। এর আগে পর্যন্ত জানে না, বললে কি উত্তর দেবে। এই যে না জানার অবস্থা, না জানার অবস্থায় যে থাকা, এটাও একটা স্তরে রয়েছে (একজন কি বলবে, আর একজন কি উত্তর দেবে)। এই যে **অজানার অবস্থা, ইহা জানার অবস্থার একটা স্তর। জানার জন্য যে আগ্রহ প্রকাশ করছো বা আগ্রহে অপেক্ষা করে আছ, ইহা একাগ্রতার এক অবস্থা।** এই একাগ্রতা কোথা থেকে এল? তোমার ভিতর দিয়ে জানার স্রোত বয়ে যাচ্ছে অজানারূপ স্তরের ভিতর দিয়ে। সেইজন্যই একাগ্রতা বিদ্যমান। ইহাই একজাতীয় সমাধিস্থ অবস্থা (যেমন মাটির নীচে জল, বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। খনন না করলে জানা যায় না)। ধ্যান ও ধ্যেয় বস্তু না আসা পর্যন্ত সাধক যে ধ্যানের আসনে বসে আছে, ইহাই সমাধিস্থ অবস্থা। থার্মোমিটারের পারদের ন্যায় উঠতে থাকে, অজানা-জানা, অজানা-জানা, এমনি করে চলেছে।

চলার মাঝে যে অজানা, তাও সমাধি। ঘুমিয়ে থাকার অবস্থাও একরূপ সমাধি, যাহাকে Pakistan, Hindusthan বলা যেতে পারে। মাঝে ধরো ৫ মাইল No man's land. স্বপ্নের অবস্থা জাগ্রতেরই আর একরূপ। যে বিচরণ এই জাগরণে করছি, এর যে শক্তি, গুণ, বিকাশ, সব যখন সেই স্তরে গিয়ে ধাক্কা দেয়, মনটি ওগুলোর ন্যায় হয়ে আর একটি রূপের বিকাশ করে, আর একটি রাজত্বে, মনের

একাগ্রতায়। এই যে তৈয়ারী করা, এটা একাগ্রতারই এক রূপ। চলচ্চিত্রের খেলা পিছনে, দেখে সম্মুখে। স্বপ্নের বিষয়বস্তুতে যেরূপ খেলা চলছে, সকলই সেইরূপ হয়ে যাচ্ছে। এই ঘুমিয়ে থাকা শুধু বিশ্রাম নয়, এতে সমাধির দ্বারা কাজ এগিয়ে চলেছে। সেই একাগ্রতা যদি বাস্তবে আনা যায় অর্থাৎ স্বপ্নের ঐ জাতীয় সমাধির অবস্থা যদি জাগরণে প্রতিষ্ঠা করা যায়, এবং একাগ্রতার মাত্রা ঠিক রাখতে পারে, তবে বাস্তবেও স্বপ্নের ন্যায় সফলতা আসতে পারে।

সাধক বুঝতে পারে না, স্বপ্নের রাজত্বই ঠিক, না জাগরণের রাজত্ব ঠিক। দুইটাকে সে এক করতে পারে না। তখন সাধক বিরাট চেষ্টার দ্বারা, মনের একাগ্রতার দ্বারা গভীর তন্ময়তায় সাধনা আরম্ভ করলো দুইটিকে এক করে দেবার জন্য। সেই অনুযায়ী মাত্রাকে ধরে এনে যখন আটক রাখতে পারলো, তখন সে সফল হলো। তখনই সাধক বুঝতে পারলো, সাধনার অর্থই হচ্ছে বিরাট বিশ্বকে বুঝতে পারা। আমাদের না বুঝাটাও ঐ সমাধিতে সফল হওয়ারই একটা বাণী। এক জাতীয় সাধনায় সফলতার বাণী রয়েই চলেছে। আমরা চাইছি বেসুরকে সুরে আনতে। কিন্তু অবস্থার চাপে বেসুরের দিকেই যেন চলেছি।

সব সময়ে যে মনের স্বাদের সঙ্গে মিলতে হবে, তার কোন কথা নেই। এই যন্ত্রণার সুর যন্ত্র সঙ্গীতেরই এক সুর। এই সুর নানা অবস্থার মিলিত ধ্বনি।

সত্য যদি সাধনা থাকে, আর নিয়ম যদি ঠিক থাকে, তবে পতন কিছুতেই হতে পারে না। সত্য প্রতিষ্ঠা ও জ্ঞানের জন্য ব্যাকুলতা, ইহাই ছিল আমার মন ও প্রাণ। অর্থের জন্য নিজেকে বিক্রী করি নাই। জানা ছিল আমার কাজ; প্রাপ্য বা প্রাপ্তি আমার নয়।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

	পুস্তক পরিচিতি	*প্রকাশকাল*
১)	বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২)	মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩)	পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪)	সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫)	অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬)	১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭)	বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮)	শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯)	তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০)	দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১)	পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২)	অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩)	বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪)	সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫)	পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬)	জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭)	মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮)	আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯)	কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০)	জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১)	তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২)	মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩)	পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫
২৪)	চেতনা ও মহাচৈতন্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬
২৫)	মনই সৃষ্টির উৎস	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬
২৬)	সাধু হও সাবধান	শুভ মহালয়া, ১৪১৬
২৭)	লং পাহাড়ের ডায়েরী	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৬
২৮)	বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদ	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯
২৯)	যত্র জীব তত্র শিব	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৬
৩০)	ম্যাসেঞ্জার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৭
৩১)	আলোর পথিক	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৭
৩২)	নাদ ব্রহ্ম	শুভ রাখী পূর্ণিমা, ১৪১৭
৩৩)	বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৭
৩৪)	চিন্তন	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০১০
৩৫)	মহা জাগরণ	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৭
৩৬)	পাপ পুণ্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৮
৩৭)	মুক্তির পথ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৮
৩৮)	ঘুম সমাধি সাধনার চাবিকাঠি	শুভ মহালয়া, ১৪১৮

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫